অধ্যায় - ৪১

ছবির কথা, ন্যাকড়া চুরি এবং জ্ঞানেশ্বরী পড়ার কাহিনী।

গত অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার ন' বছর পর, আলী মুহম্মদ হেমাডপন্তের সাথে দেখা করেন এবং নিজের গল্পটা এই ভাবে পুরো করেন -

"একদিন বম্বেতে বেড়াতে-বেড়াতে, আমি একটা দোকান থেকে বাবার একটা ছবি কিনি। সেটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে, নিজের বাড়ীর দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দিই। বাবার প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক প্রেম ছিল। যখন আমি আপনাকে (হেমাডপন্তকে) সেই ছবিটি দিই, তার তিন মাস আগে আমার পা'য়ে একটা ফোঁড়া হয়েছিল। সেটি অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল। আমি আমার শ্যালক নূর মুহম্মদের বাড়ীতে ছিলাম। আমার বান্দ্রার বাড়ীতে, তিন মাস ধরে তালা দেওয়া ছিল এবং সেই সময় ওখানে কেউ থাকত না। শুধু সুপ্রসিদ্ধ বাবা আব্দুল রহমান, মৌলানা সাহেব, মুহম্মদ হুসেন, সাই বাবা, তাজুদ্দীন বাবা এবং অন্যান্য সন্তরা ছবির রূপে, সেখানে বিরাজমান ছিলেন। কিন্তু কালচক্র তাঁদেরও নিস্তার দেয় না। আমি ওখানে (বম্বেতে) রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাহলে আর আমার বাড়ীতে লোকেদের (ছবি) কষ্ট দেওয়া কেন? আমার মনে হয় যেন তাঁরাও জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত নন। অন্য সব ছবিগুলির ভাগ্যে যা ছিল, তাই-ই হয়। কিন্তু শ্রী সাইবাবার ছবিটি কি করে রক্ষা পেল, এর রহস্য উদ্ধার এখনো পর্যন্ত কেউ করে উঠতে পারেনি। এ থেকে শ্রী সাইবাবার সর্বব্যাপকতা এবং তাঁর অসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কয়েক বছর আগে মুহম্মদ হুসেন থাবিয়া টোপন্ আমাকে (সন্ত) বাবা আব্দুল রহমানের একটা ছবি দেন। সেটা আমি আমার শ্যালক নূর মুহম্মদ পীর ভাইকে দিয়ে দিই। সেটা গত আট বছর থেকে ওঁর টেবিলেই পড়েছিল। একদিন যখন ছবিটির উপর ওঁর চোখ পড়ে, তখন সেটা ফোটোগ্রাফারের কাছে নিয়ে গিয়ে, ওটাকে বড় করিয়ে তার প্রতিলিপি কয়েকজন আত্মীয়কেও দেন। একটা প্রতিলিপি আমিও পাই, যেটা আমি নিজের ঘরে রেখেছিলাম। নূর মুহম্মদ, সন্ত আব্দুল রহমানের শিষ্য ছিলেন। এক দিন রহমান বাবার দরবারে সব লোকেদের সামনেই, নূর মুহম্মদ তাঁকে সেই ছবিটি উপহার দেওয়ার জন্য তাঁর সামনে রাখেন। ছবিটি দেখেই তিনি রেগে গিয়ে, মুহম্মদকে মারতে ছোটেন এবং ওঁকে বাইরে বার করে দেন। নূর মুহম্মদ অত্যন্ত ক্ষুন্ন ও বিষন্ন হন। উনি ভাবেন অতগুলো টাকা মিছিমিছিই খরচ করলেন, যার পরিণামে কেবল গুরুর বিরূপতা ও অসন্তোষ জুটলো। ওঁর গুরু, মূর্তি পূজোর বিরোধী ছিলেন। নূর মুহম্মদ ছবিটা হাতে নিয়ে 'অ্যপোলো' বন্দর পৌঁছান এবং একটা নৌকো ভাড়া করে সমুদ্রের মাঝামাঝি সেই ছবিটা বিসর্জন দিয়ে আসেন। উনি নিজের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে সব (মোট ছটি) ছবিগুলি ফেরত আনিয়ে নেন। এক জেলের সাহায্যে সব ক'টি ছবি, বান্দ্রার কাছে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন।

সে সময় আমি আমার শ্যালকের বাড়ীতে ছিলাম। নূর মুহম্মদ আমায় পরামর্শের সুরে বলেন- "যদি তুমি সব সন্তদের ছবি সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও তাহলে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে।" এই শুনে আমি ম্যানেজার মেহতাকে নিজের বাড়ী পাঠাই এবং বাড়ীতে টাঙ্গানো সব ছবিগুলো সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে বলি। পাঁচ মাস পর বাড়ী ফিরে

বাবার ছবিটি যেমন-কে-তেমন টাঙ্গানো দেখে, আমার খুব আশ্চর্য্য লাগে। আমি বুঝে উঠতে পারি না যে, মেহতা অন্য সব ছবিগুলো তো বার করে ভাসিয়ে দেয়, তবে কেবল এই ছবিটিই কি করে থেকে গেলো। আমি তক্ষুনি সেটি নামিয়ে নিই এই ভেবে যে, আমার শ্যালকের চোখ পড়লে, সে এটাও নষ্ট করে ফেলবে। যখন আমি এই চিন্তা করছিলাম যে, কে এই ছবিটি যত্ন করে সামলে রাখতে পারবে, তখন যেন স্বয়ং সাইবাবাই আমায় নির্দেশ দেন- 'ইস্মু মুজাওরের কাছে গিয়ে তার সাথে পরামর্শ করো এবং তার কথা মত কাজ করো।' আমি মৌলানা সাহেবের সাথে দেখা করি এবং ওঁকে সব কথা জানাই। কিছুক্ষণ ভাবার পর উনি এই স্থির করেন যে, সেটি আপনাকেই (হেমাডপন্ত) দেওয়া উচিত। একমাত্র আপনিই এটি ভালো ভাবে সামলে রাখতে পারবেন। তাই আমরা দুজনে আপনার বাড়ী আসি এবং উপযুক্ত সময় এই ছবিটি আপনাকে দিই। এই ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বাবা ত্রিকালদর্শী এবং তিনি কি অপূর্ব কৌশলে সমস্যার সমাধান করে ভক্তদের ইচ্ছে পূরণ করেন।"

নিম্ন লিখিত কাহিনী এই বিষয়ের প্রতীক যে যাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহী, তাঁদের বাবা কত ভালোবাসতেন এবং কিভাবে তাঁদের সমস্ত অসুবিধে দূর করে তাঁদের সুখী করতেন।

ন্যাকড়া চুরি এবং জ্ঞানেশ্বরীর পঠন ঃ-

শ্রী বি. ভি. দেবের বহু দিনের ইচ্ছে অন্যান্য ধার্মিক গ্রন্থ গুলির সাথে সাথে 'জ্ঞানেশ্বরী'ও পাঠ করেন। (জ্ঞানেশ্বরী শ্রী জ্ঞানেশ্বর মহারাজের দ্বারা রচিত ভগবদ্গীতার মারাঠী টীকা) উনি রোজ

ভগবদ্গীতার একটা অধ্যায় এবং অন্যান্য গ্রন্থের কিছু-কিছু অংশ পাঠ করতেন। কিন্তু জ্ঞানেশ্বরীর পাঠ শুরু করতেই, কোন না কোন বাধা উপস্থিত হত। তিন মাসের ছুটি নিয়ে উনি শিরডী আসেন। সেখান থেকে নিজের বাড়ী যান বিশ্রামের জন্য। অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থ তো উনি পড়তেন ঠিকই, কিন্তু যেই 'জ্ঞানেশ্বরী' খুলে বসতেন, অমনি নানা রকমের এলোমেলো দুঃশ্চিন্তা ওঁকে এমন ভাবে ঘিরে ধরত যে, অগত্যা তাঁকে পাঠ বন্ধ করতে হত। অনেক চেষ্টা করার পরও, যখন দু-চার লাইনও পড়ে উঠতে পারলেন না, তখন উনি স্থির করেন- "যখন দয়ানিধি শ্রী সাই-ই কৃপা করে এই গ্রন্থপাঠ করার আদেশ দেবেন তখনই শুরু করব।' **১৯১৪** সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উনি সপরিবারে শিরডী আসেন। শ্রীযোগ ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি কি রোজ জ্ঞানেশ্বরী পাঠ করেন?" শ্রীদেব উত্তর দেন যে- "আমার ইচ্ছে তো খুব হয়, কিন্তু এখনো সফল হতে পারিনি। যখন বাবা আদেশ করবেন তখনই পাঠ শুরু করব।" শ্রী যোগ পরামর্শ দেন- "গ্রন্থটির একটি প্রতিলিপি কিনে, বাবাকে নিবেদন করুন। তিনি সেটি স্পর্শ করে ফিরিয়ে দেওয়ার পর, পাঠ শুরু করলে লাভ হবে।" শ্রীদেব বলেন- "আমি এই পদ্ধতিটি ঠিক মনে করি না। বাবা তো অন্তর্যামী এবং আমার হৃদয়ের ইচ্ছে তাঁর কাছে কি করে গুপ্ত থাকতে পারে? তিনি স্পষ্ট শব্দে আদেশ দিয়ে আমার মনের ইচ্ছে কি পূরণ করবেন না?"

শ্রীদেব বাবার দর্শন করেন এবং এক টাকা দক্ষিণা দেন। তখন বাবা ওঁর কাছে আরো কুড়ি টাকা দক্ষিণা চান, সেটিও দিলেন। রাত্রে শ্রীদেব বালকরামের সাথে দেখা করেন এবং ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি কি ভাবে বাবার ভক্তি ও কৃপা ধন্য হলেন?" বালকরাম

বলেন- "আমি কাল আরতি শেষ হওয়ার পর, আপনাকে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শোনাব।" পরের দিন যখন শ্রীদেব দর্শনার্থে মস্‌জিদে যান, তখন বাবা ওঁর কাছে আবার কুড়ি টাকা দক্ষিণা চান এবং উনি খুশী হয়ে সেটি দেন। মস্‌জিদে ভিড় দেখে, উনি একদিকে গিয়ে একান্তে বসেন। বাবা ওঁকে ডেকে নিজের কাছে বসান।

আরতি শেষ হওয়ার পর, যখন সবাই নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে গেছে, তখন শ্রীদেব বালকরামের সঙ্গে দেখা করে, ওঁর পূর্ব ইতিহাস জানার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং বাবার দেওয়া উপদেশ ও ধ্যানাদির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বালকরাম এই সব প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় চন্দ্রু এসে জানায় যে শ্রীদেবকে বাবা ডাকছেন। শ্রীদেব মস্‌জিদে যেতেই বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে উনি কার সাথে এবং কি কথাবার্তা বলছিলেন। শ্রীদেব উত্তর দেন যে উনি শ্রী বালকরামের কাছে তাঁর কীর্তির গুণগান শুনছিলেন। তখন বাবা ওঁর কাছে আবার **২৫** টাকা দক্ষিণা নিয়ে, ওঁকে ভেতরে নিয়ে যান। আসন গ্রহণ করার পর, ওঁর উপর দোষারোপ করে বলেন- "আমার অনুমতি না নিয়েই তুমি আমার ন্যাকড়া (পুরনো কাপড়ের টুকরো) চুরি করেছ।" শ্রীদেব উত্তর দেন- "ভগবান! যতদূর আমার মনে পড়ে, আমি তো এরকম কোন কাজ করিনি।" কিন্তু বাবা কারো কথা কোথায় শুনতেন? তিনি শ্রীদেবকে ভালভাবে খুঁজতে বলেন। শ্রীদেবও তন্নতন্ন করে খোঁজেন, কিন্তু কোথাও কিছু পান না। তখন বাবা রেগে গিয়ে বলেন- "এখানে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তুমিই চোর। তোমার চুল তো পেকে গেছে আর এত বুড়ো হয়ে গিয়েও কি না তুমি এখানে চুরি করতে এসেছ?" এরপর বাবার চোখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। তিনি ভীষণ ভাবে গালাগালি দিতে শুরু করেন।

শ্রীদেব শান্ত হয়ে সব শুনছিলেন। মনে ভাবলেন- এরপর বুঝি মারই খেতে হবে। প্রায় এক ঘন্টা পর, বাবা ওঁকে 'ওয়াড়া'য় ফিরে যেতে বলেন। ওয়াড়ায় ফিরে উনি যোগ ও বালকরামকে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বললেন। দুপুরের পর বাবা সবার সাথে শ্রীদেবকেও ডেকে পাঠান। বলেন- "বোধহয় আমার কথাগুলি এই বৃদ্ধের মনে কষ্ট দিয়েছে। ইনি চুরি করেছেন, কিন্তু স্বীকার করছেন না।" তিনি শ্রীদেবের কাছে আবার বারো টাকা দক্ষিণা চান। শ্রীদেব সেটি আনন্দ সহকারে জোগাড় করে বাবাকে দিয়ে প্রণাম করেন। তখন বাবা দেবকে বলেন- "তুমি আজকাল কি করছ?" দেব উত্তর দেন- "কিচ্ছু না।" তখন বাবা বলেন- "পুঁথি (জ্ঞানেশ্বরী) পাঠ করা শুরু করো। যাও, ওয়াড়ায় বসে রোজ পড়, আর যেটুকু তুমি পড়বে তার অর্থ অন্যদের প্রেম ও ভক্তি ভরে বোঝাবে। আমি তোমায় সোনার কাজ-করা দামী শাল উপহার দেওয়ার জন্য, সব সময় প্রস্তুত রয়েছি। তাহলে, তুমি অন্যদের কাছে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোর আশায় কেন যাও? এটা কি তোমায় শোভা দেয়?"

পুঁথি পড়ার আদেশ পেয়ে দেব অতি প্রসন্ন হন। উনি ভাবেন- "আমি যা চাইছিলাম সেটাই পেয়ে গেছি এবং এবার আমি সচ্ছন্দে (জ্ঞানেশ্বরী) পড়তে পারব।" উনি বাবাকে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন এবং বলেন- "হে প্রভু! আমি আপনারই শরণে এসেছি। আপনার অবোধ শিশু। আমায় পাঠ করতে সাহায্য করবেন।" এবার উনি ন্যাকড়ার অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারেন। বালকরামের কাছে যা জানতে চাইছিলেন, সেটা ন্যাকড়া তুল্য। এই সব বিষয়ে, বাবা এই ধরনের ব্যবহার পছন্দ করতেন না। তিনি স্বয়ং সব রকমের প্রশ্নের উত্তর বা সন্দেহ দূর করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। অন্যদের কাছে

নিরর্থক জিজ্ঞাসাবাদ করা, তিনি ভালোবাসতেন না। তাই তিনি শ্রীদেবের উপর রেগে যান এবং ওঁকে বকেন। শ্রীদেব এই শব্দগুলিকে বাবার শুভ আশীর্বাদ মনে করেন এবং সন্তুষ্ট মনে বাড়ী ফিরে যান।

এই ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় না। আদেশ দেওয়ার পর বাবা শান্ত হয়ে বসে থাকেন নি। এক বছর পর, তিনি শ্রী দেবের কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়েছেন, পুঁথি পাঠ কতদূর এগোল। ২রা এপ্রিল ১৯১৪ সাল, বৃহস্পতিবার বাবা স্বপ্নে শ্রীদেবকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি পুঁথি ঠিক ভাবে বুঝতে পারছ?" দেব উত্তর দেন- 'না'। তখন বাবা বলেন- "আর কবে বুঝবে?" শ্রীদেবের চোখ থেকে টপ্-টপ্ করে জল পড়তে থাকে এবং উনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন- "হে ভগবান, যতক্ষন আপনার কৃপা রূপী মেঘ বর্ষন না হবে, ততক্ষন তার অর্থ বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই পাঠ, ভারস্বরূপই রয়ে যাবে।" তখন বাবা বলেন- "আমার সামনে পড়ে শোনাও। তুমি পড়ার সময় বড্ড তাড়াহুড়ো করো।" তারপর জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আধ্যাত্ম বিষয়ক অংশটি পড়তে বলেন। শ্রীদেব পুঁথি আনতে যান এবং এই সময়ে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এবার পাঠক স্বয়ং এই কথা কল্পনা করতে পারেন যে দেব এই স্বপ্নের পর কতখানি আনন্দ অনুভব করেছিলেন। শ্রীদেব এখনো (১৯৪৪ সাল) জীবিত আছেন এবং চার-পাঁচ বছর আগে ওঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আমি যতদূর জানি উনি এখনো জ্ঞানেশ্বরী পাঠ করেন। ওঁর জ্ঞান অগাধ ও পূর্ণ। শ্রীসাইয়ের লীলা সম্বন্ধে লেখা ওঁর প্রবন্ধে, এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় (তারিখ ১৯.১০.১৯৪৪)।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪২

মহাসমাধির দিকে (১)

পূর্ব্বাভাস, রামচন্দ্র দাদা পাটীল এবং তাত্য়া কোতে পাটীলের মৃত্যু এড়ানো, লক্ষ্মীবাঈ শিন্দেকে দান, শেষ মুহূর্ত।

প্রস্তাবনা ঃ-

গত অধ্যায়ের ঘটনাগুলি হ'তে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গুরু-কৃপার কেবল একটি রশ্মি ভবসাগরের ভয় থেকে মুক্ত করে দেয় এবং মুক্তির পথ সুগম ক'রে দুঃখকে সুখে পরিবর্ত্তিত করে। যদি সদ্গুরুর মোহবিনাশকারী পূজণীয় চরণ দুটি সর্বদা স্মরণ করতে থাকো তাহ'লে তোমার সমস্ত কষ্ট এবং ভবসাগরের দুঃখ শেষ হয়ে যাবে। তাই যারা নিজের কল্যাণের জন্য চিন্তিত, তাদের সাই সমর্থের অলৌকিক মধুর লীলামৃত পান করা উচিত। এই ভাবে তাদের মন শুদ্ধ হবে। প্রারম্ভে ডাক্তার পণ্ডিতের পূজো এবং কিভাবে উনি বাবাকে ত্রিপুন্ড্র লাগিয়ে ছিলেন এর উল্লেখ মূল গ্রন্থে করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গের বর্ণনা ১১-ই অধ্যায়ে করা হয়ে গেছে, তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়।

পূর্ব্বাভাস

পাঠকগণ, আপনারা এতদিন শুধু বাবার জীবনের কাহিনী শুনেছেন। এবার আপনারা মন দিয়ে বাবার মহাপ্রয়ানের কাহিনী শুনুন। ২৮সেপ্টেম্বর, ১৯১৮, বাবার সামান্য জ্বর হয়। এই জ্বর দু-তিন

দিন থাকে। এরপর বাবা খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেন। তাতে ক্রমশঃ তাঁর শরীর রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে গেল। ১৭ দিন পর অর্থাৎ ১৫-ই অক্টোবর, ১৯১৮ বেলা দুটো বেজে তিরিশ মিনিটে, তিনি এই দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন (এই সময়টি প্রোফেসর জি. জি. নারকের পত্রের অনুসারে লেখা হয়েছে। এই পত্রটি উনি ৫.১১.১৯১৮ তে দাদা সাহেব খাপার্ডেকে লিখেছিলেন এবং সেই বছর সাইলীলা পত্রিকার ৭-৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল)। এর দু-বছর আগে বাবা তাঁর লোকান্তর গমনের পূর্ব্বাভাস দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন কেউই বুঝতে পারেনি। ঘটনাটি এইরূপ - বিজয় দশমীর দিন যখন সবাই সন্ধ্যার সময় বিসর্জনের পর ফিরছিল, তখন বাবা হঠাৎই রেগে ওঠেন। মাথার কাপড়, কফ্নী, এবং কৌপীন খুলে সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে, জ্বলন্ত ধুনিতে ফেলে দেন। বাবার দেওয়া আহুতি পেয়ে ধুনি দ্বিগুণ জোরে জ্বলে ওঠে, এবং বাবার মুখের প্রভা তার চেয়েও উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল। তিনি পূর্ণ নগ্নবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তাঁর চোখ দুটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লাল। তিনি চিৎকার করে বলেন- "তোরা এখানে আয়। আমায় ভালো করে দেখে নে, আমি হিন্দু না মুসলমান।" সবাই ভয়ে কাঁপছিল। কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস করল না। কিছুক্ষণ পর ভাগোজী শিন্দে (যিনি মহারোগে ভুগছিলেন) সাহস করে বাবার কাছে যান, এবং কোনরকমে তাঁর কৌপীনটি বেঁধে বলেন- "বাবা! এ কি কথা? দেব, আজ যে দশমীর উৎসব।" তাতে তিনি নিজের দন্ডটা মাটিতে ঠুকে বলেন- "এটা আমার সীমোল্লঙ্ঘন।" প্রায় রাত ১১-টা পর্যন্ত তাঁর রাগ শান্ত হয় না এবং ভক্তদের 'চাওড়ী' শোভাযাত্রা বেরোবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। এক ঘন্টার পর বাবা শান্ত হন, এবং পোষাক-আষাক পরে 'চাওড়ী' মিছিলে সম্মিলিত হন। এই ঘটনাটির মাধ্যমে বাবা ইঙ্গিত

দেন যে, তাঁর পক্ষে জীবন-রেখা পার হয়ে যাবার, 'দশেরা' বা 'বিজয়া-দশমী'ই উচিত দিন। কিন্তু সেই সময়, কেউ তার আসল অর্থ বুঝতে পারেনি। বাবা আরোও অনেক আভাস দেন। যেমন -

রামচন্দ্র দাদা পাটীলের মৃত্যু এড়ানো ঃ-

এর কিছুদিন পর রামচন্দ্র পাটীল খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। উনি খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। সব রকমের চিকিৎসা করা হয় কিন্তু কিছুতেই লাভ হয় না। হতাশ হয়ে মৃত্যুরূপী শেষ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করতে শুরু করেন। সেই সময় একদিন মাঝরাতে বাবা ওঁর মাথার কাছে এসে দাঁড়ান। পাটীল ওঁর পা জড়িয়ে ধরে বলেন- "আমি বাঁচার সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছি। এবার কৃপা করে আমায় বলুন, আমার প্রাণ কখন বেরোবে?" দয়াসিন্ধু বাবা বলেন- "চিন্তা কোর না। তোমার 'হুন্ডী' ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তুমি খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে। আমার শুধু তাত্য়ার জন্য ভয় হচ্ছে - ১৯১৮ সালে 'বিজয়া-দশমী'র দিন সে দেহ ত্যাগ করবে। কিন্তু এই কথাটা কাউকে বোল না এবং ওকেও জানিও না। ও তাহলে ভয় পেয়ে যাবে।" রামচন্দ্র এরপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন, কিন্তু ওঁর তাত্য়ার জন্য ভয় হত। উনি জানতেন যে বাবার কথা কখনো মিথ্যা হয় না এবং দু-বছর পরই তাত্য়ার মৃত্যু অবধারিত। উনি এই কথাটি বালাশিম্পী ছাড়া কাউকে জানান নি। দুটি ব্যক্তি - রামচন্দ্র দাদা এবং বালাশিম্পী তাত্য়ার জীবন সম্বন্ধে চিন্তাগ্রস্ত এবং আশঙ্কান্বিত ছিলেন।

রামচন্দ্র বিছানা ছেড়ে চলতে-ফিরতে শুরু করেন। সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। ১৯১৮ সালে ভাদ্রমাস শেষ হয়ে আশ্বিন মাস শুরু হবে, এমন সময় বাবার কথা মত তাত্য়া অসুস্থ হয়ে

শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ওঁর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। উনি বাবার দর্শন করতেও যেতে পারতেন না। তাত্য়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাবার উপর এবং বাবার শ্রীহরির উপর, যিনি তাঁর সংরক্ষক। তাত্য়ার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যেতে লাগল। এখন উনি আর নড়তে-চড়তেও পারতেন না এবং সর্বদা বাবাকেই স্মরণ করতেন। এদিকে বাবাও জ্বরে ভুগছিলেন এবং তাঁর অবস্থাও দিনের-পর-দিন শোচনীয় হতে লাগল। তারপর নির্দ্ধারিত 'বিজয়া-দশমী'র দিনও কাছে এসে পড়ল। তখন রামচন্দ্র দাদা ও বালাশিম্পী খুবই ঘাবড়ে যান। শরীর কাঁপতে থাকে এবং ভয়ে গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। বিজয়া-দশমীর দিন তাত্য়ার নাড়ীর বেগ কমে যায় এবং মনে হচ্ছিল যেন ওঁর মৃত্যু শিয়রে। ঠিক এই সময় একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। তাত্য়ার ফাঁড়া কেটে গেল। ওঁর প্রাণ বেঁচে গেল, পরিবর্ত্তে বাবাই চলে গেলেন। মনে হল যেন, পরস্পরের হস্তান্তরণ হয়ে গেল। সবাই বলে যে, বাবা তাত্য়ার জন্য প্রাণত্যাগ করেন। এমনটি তিনি কেন করলেন, সেটা শুধু তিনিই জানেন। এই কথাটি আমাদের বুদ্ধির বাইরে। এমনও হতে পারে যে, বাবা নিজের শেষ সময়ের ইঙ্গিত, তাত্য়ার নাম নিয়ে দিয়েছিলেন।

পরের দিন ১৬ই অক্টোবর ভোরবেলা বাবা দাসগণুকে পন্ঢরপুরে স্বপ্ন দেন যে, "মস্জিদ হঠাৎ পড়ে গেছে। শিরডীর সব তেল-ওয়ালা আর মুদিরা আমায় উত্যক্ত করত। তাই আমি ঐ স্থান ছেড়ে দিলাম। আমি তোমায় এই বলতে এসেছি যে, তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে আমায় সব রকমের ফুল দিয়ে ঢেকে দাও।" দাসগণু শিরডী থেকেও একটা চিঠি পান। উনি নিজের শিষ্যদের নিয়ে শিরডী আসেন এবং বাবার সমাধির সামনে, অখন্ড কীর্তন ও হরিনাম জপ শুরু করেন।

উনি নিজে ফুলের মালা গেঁথে, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বাবার সমাধিতে অর্পণ করেন। বাবার নামে খুব বড় দরিদ্র-নারায়ণ ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

লক্ষ্মীবাঈকে দান ঃ-

বিজয়া-দশমীর দিন হিন্দুদের জন্য খুবই পবিত্র। যদিও কিছুদিন থেকে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ ভাবে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। শেষ মুহূর্তের ঠিক আগে তিনি কারো সাহায্য না নিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসেন এবং তাঁকে দেখে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হচ্ছিল। লোকেরা ভাবে- "ফাঁড়া কেটে গেছে। ভয়ের আর কিছু নেই। এবার বাবা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।" কিন্তু তিনি জানতেন যে এবার তাঁর যাবার সময় এসে গেছে। তাই তিনি লক্ষ্মীবাঈ শিন্দেকে কিছু দান দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে বাবার বাস ঃ-

শ্রীমতি লক্ষ্মীবাঈ শিন্দে এক অবস্থাপন্ন ও মধুরস্বভবা মহিলা ছিলেন। উনি মস্জিদে বাবার দিন-রাত সেবা করতেন। ভগত মহালসাপতি, তাত্য়া ও লক্ষ্মীবাঈ ছাড়া রাতে মস্জিদের সিঁড়িতে কেউ পা রাখতে পারত না। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা যখন তাত্য়ার সাথে মস্জিদে বসেছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মীবাঈ এসে তাঁকে প্রণাম করেন। বাবা বললেন- "আরে লক্ষ্মী, আমার ভীষন ক্ষিধে পেয়েছে।" "বাবা, একটু অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষুনি আপনার জন্য রুটি নিয়ে আসছি"- এই বলে লক্ষ্মীবাঈ বাড়ী ফিরে যান। একটু পরেই, বাবার জন্য রুটি ও তরকারী নিয়ে এসে, বাবার সামনে রাখেন। বাবা সেগুলি একটা ক্ষুধার্ত কুকুরকে দিয়ে দেন। তখন লক্ষ্মীবাঈ বলেন- "বাবা,

এ কি? আমি আপনার জন্য নিজের হাতে রুটি বানিয়ে আনলাম। আপনি এক টুকরোও মুখে না দিয়ে, সেটা কুকুরকে দিয়ে দিলেন? তাহলে আপনি আমায় শুধু-শুধু কষ্ট দিলেন কেন?" বাবা উত্তর দেন- "মিছিমিছি দুঃখ পেও না। কুকুরের ক্ষিধে শান্ত করা আমাকে তৃপ্ত করারই সমান। কুকুরেরও তো আত্মা আছে। প্রাণীদের আকৃতি-প্রকৃতি যদিও বিভিন্ন রকমের হয়, যেমন কেউ কথা বলতে পারে বা কেউ মূক, কিন্তু ক্ষিধে তো সবারই পায়। এই কথাটা তুমি সর্বদা মনে রেখো যে, যে ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ায়, সে আসলে আমাকেই খাওয়াচ্ছে। এটা একটা অকাট্য সত্য।" এই সাধারণ ঘটনাটির দ্বারা, বাবা একটা মহান আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করেন যে, কাউকে মনে কষ্ট না দিয়ে, কিভাবে আমাদের নিত্য ব্যবহার করা উচিত। এরপর লক্ষ্মীবাঈ রোজ প্রেম ও ভক্তিপূর্বক দুধ, রুটি ও অন্যান্য খাবার নিয়ে আসতে শুরু করেন এবং বাবাও সেগুলি রসিয়ে খেতেন। খানিকটা খেয়ে বাকীটা লক্ষ্মীবাঈকে দিয়ে রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। রাধাকৃষ্ণমাঈ এই উচ্ছিষ্ট অন্ন, প্রসাদ মনে করে, তৃপ্তিসহকারে গ্রহণ করতেন। এই রুটির ঘটনাটি অপ্রাসঙ্গিক ভাবা উচিত নয়। এতে দেখানো হয় যে সাইবাবা সর্বজীবে কি ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েও তদুর্দ্ধে উঠেছিলেন। তিনি সর্বব্যাপী, জন্মমৃত্যুহীন এবং অমর।

লক্ষ্মীবাঈয়ের সেবা বাবা জীবনের শেষ অবধি মনে রাখেন। বাবা সে সব ভুলতেও বা কি করে পারতেন? দেহত্যাগের ঠিক আগে, তিনি নিজের পকেটে হাত দিয়ে, প্রথমে ৫ টাকা এবং পরে ৪ টাকা, - মোট ৯ টাকা ওঁকে দেন। এই ন'-য়ের সংখ্যা এই বইতে (অধ্যায় ১২) বর্ণিত নববিধা ভক্তির দ্যোতক। বা এটি সীমোল্লঙ্ঘনের সময়

দেওয়া দক্ষিণাও হতে পারে। লক্ষ্মীবাঈ এক অর্থবতী মহিলা ছিলেন। ওঁর টাকার কোন অভাব ছিল না। তাই হতে পারে বাবা প্রধান রূপে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অন্তর্গত দশম অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকের দিকে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছিলেন। এই শ্লোকে[৯] উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভক্তদের ন'টি লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে পাঁচটি এবং পরে চারটি লক্ষণ ক্রমশঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাবাও সেই ক্রমই অনুসরণ করেন (প্রথম ৫ এবং পরে ৪ মোট ৯)। কেবল ন' টাকাই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা লক্ষ্মীবাঈয়ের হাতে আসা-যাওয়া করেছে। কিন্তু বাবার দেওয়া ন' টাকা উনি চিরকাল মনে রাখবেন।

শেষ মুহূর্ত্ত ঃ-

বাবা সব সময় সজাগ ও সচেতন থাকতেন এবং শেষ সময়ে সাবধানে সবাইকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। কাকাসাহেব, শ্রীমান বুটী ও অন্যান্যরা- যাঁরা মস্‌জিদে বাবার কাছে বসেছিলেন, তাঁদেরও বাবা খাবার খেয়ে ফিরে আসতে বলেন। এই অবস্থায় ওঁরা বাবাকে একলা ছাড়তে চাইছিলেন না। কিন্তু বাবার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনও তো করতে পারতেন না। তাই ওঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারাক্রান্ত মনে, 'ওয়াড়া'য় ফিরে গেলেন। ওঁরা জানতেন যে, বাবার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন এবং এই ভাবে তাঁকে একলা ছেড়ে আসা ওঁদের উচিত হয়নি। ওঁরা খেতে তো বসেন, কিন্তু মন পড়ে ছিল অন্য কোথাও (বাবার কাছে)। তখনও খাওয়া শেষ হয়নি আর বাবার নশ্বর শরীর ত্যাগ করার সংবাদ এসে পৌঁছয়। ওঁরা খাবার থালা ছেড়ে, মস্‌জিদের দিকে দৌড়ান। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, বাবা চিরকালের মত বায়াজী আপ্পাকোতের কোলে বিশ্রাম করছেন। তিনি না নীচে ঢলে পড়েন

আর নাই তাঁকে বিছানায় শুতে হয়। নিজেরই আসনে শান্ত ভাবে বসে, নিজের হাতে দান করার ভঙ্গিমায় মানব শরীর ত্যাগ করলেন। সন্তরা স্বয়ংই দেহ ধারণ করেন, এবং কোন নিশ্চিত লক্ষ্য নিয়ে এই জগতে প্রকট হন। যখন সেই লক্ষ্য পূরণ হয়, তখন যেমন সরল ও আকস্মিক ভাবে প্রকট হয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই লুপ্ত হয়ে যান।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ ষষ্ঠ বিশ্রাম

১) অমান্যমৎসবো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ় সৌহৃদঃ।
অসত্বরোহর্থজিজ্ঞাসুরণসূয়ূর মোঘবাক্।।

৬ শ্লো, ১০অ, ১১ (ভাগবৎ)

বঙ্গানুবাদ ঃ "গুরুসেবকের ধর্ম এই যে শিষ্য ব্যক্তি অভিমানশূণ্য, নিরহঙ্কৃত অনলস, মমতারহিত, সৌহৃদ্যবিশিষ্ট, অসত্বর, অর্থজিজ্ঞাসু, অসূয়াশূণ্য ও ব্যর্থালাপ রহিত হইবেন।"

অধ্যায় - ৪৩-৪৪

মহাসমাধির দিকে (২)

সমাধি মন্দির, ইট ভাঙ্গা, ৭২ ঘন্টার সমাধি, বাপুসাহেব যোগের সন্ন্যাস, বাবার অমৃততুল্য বচন।

মূল গ্রন্থে ৪৩ ও ৪৪ অধ্যায়ে বাবার নির্বাণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই গ্রন্থে সেগুলি সংযুক্ত রূপে লেখা হচ্ছে।

পূর্বপ্রস্তুতি- সমাধি মন্দির ঃ-

হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, মরণাপন্ন মানুষকে ধার্মিক গ্রন্থ পড়ে শোনান হয়। এর প্রধান কারণ শুধু একটাই, যাতে তার মন সাংসারিক ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে যুক্ত হয়। সেই প্রাণী কর্মবশ পরের জন্মে যে দেহ ধারণ করবে, তাতে যেন সে সদ্‌গতি প্রাপ্ত করে। সবাই জানে যে, যখন রাজা পরীক্ষিতকে ব্রহ্মর্ষি পুত্র শাপ দেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল, তখন মহাত্মা শুকদেব ওঁকে সেই সাতদিন, শ্রীমদ্ ভাগবৎ পুরাণ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ফলে রাজা পরীক্ষিত মোক্ষ প্রাপ্ত করেন। এই প্রথাটি এখনো অনুসরণ করা হয়। গীতা, ভাগবৎ ইত্যাদি পবিত্র গ্রন্থ আজও মরণোন্মুখ মানুষকে শোনান হয়। বাবা তো স্বয়ং ঈশ্বরাবতার। তাই তাঁর কোন বাহ্য সাধনের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেবল লোকেদের সামনে উদাহরণ প্রস্তুত করার জন্যই, তিনি এই প্রথা উপেক্ষা করেননি। যখন তিনি জানতে পারেন যে, এবার অল্পকাল পরে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করবেন তখন তিনি শ্রী ওয়ঝেকে

'রাম বিজয়' প্রকরণ পড়ে শোনাতে আদেশ দেন। শ্রী ওয়ঝে এক সপ্তাহ ধরে, প্রতিদিন পাঠ করেন। এরপর, বাবা ওঁকে আট প্রহর পাঠ করার আজ্ঞা দেন। শ্রীওয়ঝে ঐ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আবৃত্তি তিন দিনে শেষ করে ফেলেন এবং এই ভাবে ১১ দিন কেটে যায়। এরপর উনি আরো তিন দিন পাঠ করেন। এবার শ্রীওয়ঝে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বাবা শান্ত ও আত্মস্থিত হয়ে, শেষ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে শুরু করেন। এর দু-তিন দিন আগেই, বাবা তাঁর ভোরবেলায় বেড়ানো এবং ভিক্ষা সংগ্রহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি মস্‌জিদেই বসতে শুরু করেন। নিজের শেষ সময়ের প্রতি পূর্ণ রূপে সচেতন ছিলেন। ভক্তদের ধৈর্য্য রাখতে বলতেন, কিন্তু নিজের মহানির্বাণের নিশ্চিত সময় প্রকাশ করেননি। এই সময় কাকাসাহেব দীক্ষিত ও শ্রীমান বুটী রোজ বাবার সঙ্গে একত্রে মস্‌জিদে আহার করতেন। মহানির্বাণের দিন (১৫-ই অক্টোবর) আরতি শেষ হওয়ার পর, বাবা ওঁদের নিজের 'ওয়াড়া'য় খাওয়ার জন্য ফিরে যেতে বলেন। তবুও লক্ষ্মীবাঈ শিন্দে, ভাগোজী শিন্দে, বয়াজী, লক্ষ্মণ বালাশিম্পী, এবং নানাসাহেব নিমোনকর সেখানেই বসে রইলেন। শামা মস্‌জিদের সিঁড়িতে বসে ছিলেন। লক্ষ্মীবাঈ শিন্দেকে ন' টাকা দেওয়ার পর বাবা বলেন- "আমার মস্‌জিদে আর ভালো লাগছে না, তাই আমায় বুটীর পাথরের ওয়াড়ায় নিয়ে চলো, সেখানে আমি ভালো থাকব।" এই শেষ কথাগুলি বলে, বাবা বয়াজীর দেহের উপর ভর দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভাগোজী দেখেন যে, বাবার শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেছে। নানাসাহেব নিমোনকরকে ডেকে এই কথা জানান। নানাসাহেব একটু জল এনে বাবাকে খাওয়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা বাইরেই গড়িয়ে পড়ে। সেই দেখে উনি চেঁচিয়ে ওঠেন-

"ও দেব!" তখন বাবাকে দেখে মনে হয়, যেন তিনি ধীরে করে চোখ খুলে হাল্কা স্বরে 'আহ্' বললেন। কিন্তু এবার পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি সত্যি সত্যি পঞ্চভূতের শরীর ত্যাগ করেছেন। "বাবা সমাধিস্থ হয়েছেন" - এই হৃদয় বিদারক দুঃসংবাদ, দাবানলের মত তক্ষুনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাতারে কাতারে লোক- আবালবৃদ্ধবনিতা মস্‌জিদের দিকে দৌড়ায়। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল। সবার হৃদয়ের উপর যেন বজ্রপাত হয়। শোকে ব্যাকুল হয়ে, কেউ জোরে-জোরে কাঁদছিল, কেউ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছিল তো কেউ অজ্ঞান হয়ে শিরডীর রাস্তার উপর পড়েছিল। প্রত্যেকে বেদনায় ম্রিয়মান। শিরডীতে গ্রামবাসীদের কান্নায় ও আর্তনাদে, প্রলয় কালের তান্ডব নৃত্যের দৃশ্য ভেসে উঠল। ওদের এই সাংঘাতিক দুঃখে কে এসে সান্ত্বনা দেবে যখন ওরা সাক্ষাৎ সগুণ পরমব্রহ্মের সান্নিধ্য হারিয়ে ফেলল? এই দুঃখের বর্ণনাই বা কে করতে পারে? এবার কয়েকজন ভক্তের বাবার কথাগুলি মনে পড়ে। কেউ বলল- "মহারাজ (সাই বাবা) বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি আট বছরের বালকের রূপে আবার প্রকট হবেন।" কৃষ্ণবতারেও চক্রপানী (ভগবান বিষ্ণু) এমনি লীলা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মা দেবকীকে আট বছরের এক বালকের রূপে দেখা দেন। তাঁর দিব্য তেজোময় স্বরূপ ও চার হাতে আয়ুধ (শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম) শোভা পাচ্ছিল। নিজের সেই অবতারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূ-ভার হাল্কা করেছিলেন। সাইবাবা তাঁর এই অবতারে, নিজের ভক্তদের সঙ্গে এই জন্মের সম্বন্ধ বিকশিত করে, যেন কোন কাজে কোথাও চলে গেছেন এবং ভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, উনি শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন।

এবার সমস্যা হল যে বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিভাবে করা হবে।

কয়েকজন মুসলমান বলেন যে, তাঁর দেহকে কবরস্থানে সমাধিস্থ করে, তার উপরে একটা সমাধি মন্দির বানানো উচিত। খুশালচন্দ ও আমীর শক্করেরও এই মত ছিল। কিন্তু গ্রাম্য অধিকারী শ্রী রামচন্দ্র পাটীল দৃঢ় ও নিশ্চয়সূচক স্বরে বলেন- "তোমাদের এই নির্ণয়ে আমি রাজী নই। তাঁর পবিত্র শরীরকে বুটী 'ওয়াড়া' ছাড়া অন্যত্র কোথাও রাখা হবে না।" এই ভাবে ভক্তদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, এবং বাদ-বিবাদ **৩৬** ঘন্টা অবধি চলে। বুধবার ভোরবেলা, বাবা লক্ষ্মণ মামা যোশীকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং ওঁর হাত টেনে বলেন- "তাড়াতাড়ি ওঠো। বাপু সাহেব ভাবছে যে, আমি মরে গেছি। তাই ও তো আসবে না। তুমি পূজো ও কাকড় আরতি করো।" লক্ষ্মণ মামা গ্রামের জ্যোতিষী, শামার মামা ও এক কর্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। উনি রোজ ভোরবেলা বাবার পূজো করতেন এবং তারপর গ্রামের দেবী-দেবতাদের। ওঁর বাবার প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। তাই এই দৃষ্টান্তের পর উনি পূজোর সামগ্রী সাজিয়ে আনলেন। বাবার মুখের আবরণ সরাতেই, উনি স্তব্ধ হয়ে যান। স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই, মৌলবীদের বিরোধের চিন্তা না করে, আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজো ও 'কাকড়' আরতি করেন। দুপুরে বাপুসাহেব যোগ অন্য ভক্তদের নিয়ে সেখানে আসেন এবং নিয়মমত মধ্যাহ্ন আরতিও করেন।

বাবার শেষ শ্রীবচন শ্রদ্ধা পূর্বক স্বীকার করে, লোকেরা তাঁর পবিত্র দেহটিকে বুটী ওয়াড়াতে সমাধিস্থ করতে রাজী হয়। এবার সেই জায়গাটির মধ্যভাগ খোঁড়া আরম্ভ হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, রাহাতা থেকে সাব্ ইন্সপেক্টর এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক লোকেরা সেখানে এসে জড়ো হয়। পরের দিন সকাল বেলা বম্বে থেকে আমীর ভাই ও কোপরগ্রাম থেকে মাম্লৎদারও সেখানে এসে

পৌঁছন। কিন্তু ওঁরা এসে দেখেন যে লোকেরা এখনো একমত নয়। তখন ওঁরা মতদান করান এবং দেখেন যে অধিকাংশ লোক 'ওয়াড়া'র পক্ষতেই মত দিয়েছিল। তবুও ওঁরা এই বিষয়ে, কালেক্টারের স্বীকৃতি অতি আবশ্যক মনে করেন। তখন কাকাসাহেব স্বয়ং আহমদনগর যেতে উদ্যত হন। কিন্তু বাবার প্রেরণায়, বিপক্ষীরাও প্রস্তাব সহর্ষে স্বীকার করে নেয় এবং ওঁরা সবাই নিজেদের মতও ওয়াড়ার পক্ষেই দেন। অতএব বুধবার সন্ধ্যাবেলার বাবার পবিত্র শরীর খুব ধুমধাম করে ওয়াড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে বাবাকে সমাধিস্থ করা হল। কত ভক্তের দল আজও সেখানে এসে সুখ ও শান্তি প্রাপ্ত করে। বালাসাহেব ভাটে এবং বাবার এক অনন্য ভক্ত শ্রী উপাসনী বাবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এ কথাটা প্রোফেসর নারকেও লক্ষ্য করেন যে, বাবার শরীর **৩৬** ঘন্টা খোলা থাকা সত্ত্বেও, শক্ত হয়ে যায় নি। তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ নমনীয় ছিল। তাই তাঁর কফ্নী খোলার সময়, সেটা ছিঁড়তে হয়নি এবং সহজেই খুলে নেওয়া হয়।

ইট ভাঙ্গা ঃ-

বাবার মহাপ্রয়াণের কয়েকদিন আগে একটা কুলক্ষণ ঘটে- যেন ভাবী দুর্য্যোগের ইঙ্গিত। মস্জিদে একটা পুরানো ইট ছিল যার উপরে বাবা হাত রেখে বসতেন। রাত্রিবেলা বাবা তার উপরে মাথা রেখে শুতেন। এই ব্যবস্থাটা অনেক বছর চলে। সেইদিন বাবার অনুপস্থিতিতে, একটি ছেলে ঝাড়ু দেওয়ার সময়, ইটটা হাতে ওঠায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইটটা ওর হাত থেকে পড়ে গিয়ে, দু'টুকরো হয়ে যায়। বাবা যখন এই কথাটা জানতে পারেন, তখন তিনি খুব দুঃখিত হন এবং বলেন- "এই ইটটা ভাঙ্গায়, আমার ভাগ্যই ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে।

ঐটি ছিল আমার জীবনসঙ্গিনী। ওঁকেই কাছে রেখে, আমি আত্মচিন্তন করতাম। ঐটি আমার প্রাণপ্রিয় ছিল। আজ ও আমায় ছেড়ে চলে গেল।" অনেকে ভাবতে পারে যে, বাবার কি ইটের মত তুচ্ছ জিনিষের জন্য শোক করা উচিত ছিল? এর উত্তর হেমাডপন্ত এই ভাবে দেন যে সাধু-সন্তরা জগতের উদ্ধার এবং দীন ও অনাশ্রিতদের কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ হন। তাঁরা যখন নরদেহ ধারণ করেন, তখন তাঁরা তদোনুরূপই আচরণ করেন অর্থাৎ বাহ্য রূপে অন্যান্য লোকেদের মতই হাসেন, খেলেন, এবং কাঁদেন। কিন্তু অন্তরে তাঁরা নিজেদের অবতার কার্য্য এবং তার লক্ষ্যের বিষয় সর্বদা সজাগ থাকেন।

৭২ ঘন্টার সমাধি ঃ-

এই ঘটনার ৩২ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, বাবা একবার জীবনরেখা পার করার একটা প্রয়াস করেছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার দিনে বাবা হাঁপানিতে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, বাবা নিজের 'প্রাণ' ঊর্দ্ধে নিয়ে গিয়ে, সমাধিস্থ হওয়া স্থির করেন। অতএব উনি ভগত মহালসাপতিকে বলেন- "তুমি আমার দেহটা তিন দিন পাহারা দিও। আমি যদি ফিরে আসি তো ভালো, নাহলে ঐ স্থানে (একটা জায়গা ইঙ্গিত করে) আমার সমাধি বানিয়ে দিও এবং দু'টো ধ্বজা, চিহ্নস্বরূপ লাগিয়ে দিও।" এই বলে বাবা প্রায় রাত দশটার সময় মাটিতে শুয়ে পড়েন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল যেন তাঁর শরীরে প্রাণই নেই। লোকেরা, যাদের মধ্যে গ্রামবাসীরাও ছিল, সেখানে একত্রিত হয়েছিল। শরীরটি পরীক্ষা করার পর বাবা যেখানে বলেছিলেন, সেখানে তাঁর দেহটি সমাধিস্থ করার আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু ভগত মহালসাপতি তাদের

বাধা দেন। বাবার নিশ্চল দেহটি নিজের কোলে রেখে, তিন দিন অবধি সেটি রক্ষা করেন। তিন দিন কেটে গেলে, রাত্তির প্রায় তিনটে নাগাদ প্রাণ ফেরার চিহ্ন দেখা যায়। তাঁর নির্জীব শরীর জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। শ্বাস-প্রশ্বাস আবার সাধারণ হয়ে গেল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ে-চড়ে উঠল। তিনি চোখ খোলেন এবং জ্ঞানে ফিরে আসেন। এইটি এবং আরো অন্য প্রসঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করে, এবার আমরা এটি পাঠকদের উপরই ছাড়ছি যে, তাঁরাই নির্ণয় করুন যে, বাবা অন্য লোকেদের মত সাড়ে তিন হাত লম্বা এক দেহধারী মানব ছিলেন, যিনি কিছু বছর দেহ ধারণ করার পর সেটি ত্যাগ করেন, না কি তিনি স্বয়ং আত্মজ্যোতিস্বরূপ। পাঁচ মহাভূত দ্বারা নির্মিত হওয়ার দরুণ শরীরের নাশ হওয়া তো সুনিশ্চিত। যথার্থে অন্তঃকরণে বিরাজমান সদ্‌বস্তুই (আত্মা) পরম সত্য। তার রূপ নেই, শেষ নেই আর বিনাশও নেই। এই শুদ্ধ চৈতন্যধন বা ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয় ও মনের উপর শাসন ও নিয়ন্ত্রণকারী যে তত্ত্ব, সেইটিই সাই, যিনি সংসারের সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান এবং যিনি সর্বব্যাপী। নিজের অবতার কার্য্য করার জন্য তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন। সেই কাজ পুরো হওয়ার পর, তিনি দেহ ত্যাগ করে আবার শাশ্বত স্বরূপ ধারণ করেন। শ্রী দত্তাত্রেয়ের পূর্ণ অবতার গঙ্গাপুরের শ্রী নৃসিংহ সরস্বতীর ন্যায়, শ্রী সাই-এর মৃত্যু নেই। তাঁর নির্বাণ তো শুধু একটা নিয়মপালন মাত্র। তিনি জড় ও চেতন সব পদার্থেই ব্যাপ্ত এবং সর্বভূতের অন্তঃকরণের সঞ্চালক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। এই সত্যটি এখনো অনুভব করা যেতে পারে এবং অনেকে এরকম অনুভব করেছে- যারা অনন্য ভাবে তাঁর শরণে গেছে এবং যারা অন্তঃকরণ হতে তাঁর উপাসক। যদিও বাবার স্বরূপ এখন আর দেখতে পাওয়া যাবে না, তবুও শিরডীতে গেলে, মস্‌জিদে রাখা তাঁর জীবন্ত চিত্রটি (বাবার এক প্রসিদ্ধ

শিল্পী ভক্ত শ্রী শামরাও জয়কর এটি এঁকেছিলেন) দেখতে পাব। এক কল্পনাশীল ও ভক্তিমান দর্শককে, এই চিত্রটি এখনো বাবার সাক্ষাৎ দর্শনের সন্তোষ ও সুখ প্রদান করে। বাবা এখন আর দেহে নেই। কিন্তু তিনি সর্বভূতে ব্যাপ্ত এবং ভক্তদের কল্যাণ করছেন ও করবেন- যেমনটি তিনি জীবিতকালে করতেন। বাবা তো সন্তদের মত অমর। যদিও আবরণ রূপী নরদেহ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তো স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি, যিনি সময় সময় ভূতলে অবতীর্ণ হন।

বাপুসাহেব যোগের সন্ন্যাস ঃ-

যোগের সন্ন্যাসের বিষয়ে আলোচনা করে হেমাডপন্ত এই অধ্যায়টি শেষ করেছেন। শ্রী সখারাম হরি ওরফে বাপুসাহেব যোগ পুণের বিষ্ণু বুওয়া যোগের কাকা ছিলেন। উনি লোক নির্মান বিভাগে (P.W.D.) তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অবসর গ্রহণ করার পর সপত্নীক শিরডীতে এসে থাকতে আরম্ভ করেন। ওঁদের কোন ছেলেপিলে ছিল না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই শ্রী সাই চরণে অচল শ্রদ্ধা ছিল। ওঁরা দু'জনে বাবার পূজো ও সেবাতেই নিজেদের দিন কাটাতেন। মেঘার মৃত্যুর পর, বাপুসাহেব বাবার মহাসমাধি পর্যন্ত, মস্‌জিদে ও চাওড়ীতে আরতি করতেন। ওঁকে সাঠে ওয়াড়াতে, শ্রী জ্ঞানেশ্বরী ও শ্রী একনাথী ভাগবৎ পড়ার ও তার ভাবার্থ শ্রোতাদের বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই ভাবে অনেক বছর সেবা করার পর, উনি একবার বাবার কাছে প্রার্থনা করেন- "হে আমার জীবনের একমাত্র আশ্রয়। আপনার পূজনীয় চরণ দর্শন করে, সমস্ত প্রাণীরা পরম শান্তি অনুভব করে। আমি এই শ্রীচরণের ছায়ার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও, আমার চঞ্চল মন শান্ত ও স্থির হ'ল না। এত বছরের আমার সন্ত সৎসঙ্গ কি ব্যর্থ হবে? আমার জীবনে সেই শুভ দিন কবে আসবে, যখন আপনার

কৃপাদৃষ্টি আমার উপর পড়বে?"

ভক্তের প্রার্থনা শুনে বাবার দয়া হয়। তিনি উত্তর দেন- "কিছুদিনের মধ্যেই তোমার অশুভ কর্ম শেষ হয়ে যাবে এবং পাপ-পুণ্য জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে। আমি তোমায় সেদিন ভাগ্যবান মনে করব, যেদিন তুমি ঐন্দ্রিয়ক বিষয়গুলিকে তুচ্ছ মনে করে, সমস্ত পদার্থের প্রতি উদাসীন হয়ে, অনন্য ভাবে ঈশ্বর ভক্তি প্রাপ্ত করে, সন্ন্যাস ধারণ করবে।" কিছুদিন পর বাবার কথা ফলে গেল। ওঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর, ওর আর কোন দায়িত্ব বাকী থাকে না। উনি এবার মুক্ত হলেন। মৃত্যুর আগে সন্ন্যাস ধারণ করে নিজের জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত করেন।

বাবার অমৃততুল্য কথা ঃ-

দয়ানিধি কৃপালু শ্রীসাই সমর্থ মস্‌জিদে (দ্বারকা মাই) প্রায়ই এই অমৃত বচন বলতেন যে- **"যে আমায় অত্যধিক ভালবাসে, সে সদাই আমার দর্শন পায়। ওর জন্য আমি ছাড়া সমগ্র জগত শূণ্য। ও কেবল আমারই শরণাপন্ন হয় এবং সর্বদা আমাকেই স্মরণ করে, নিজের উপর ওর সেই ঋণ, ওকে মুক্তি (আত্মোপলব্ধি) প্রদান করে চুকিয়ে দিই। যে আমারই চিন্তন করে এবং আমার প্রেমই যার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, সে আমার সঙ্গে মিলে, তেমন বিলীন হয়ে যায় যেমন নদী সমুদ্রের সাথে মিলে একাকার হয়ে যায়। অতএব আত্মাভিমানও অহংকার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে আমার প্রতি, যিনি তোমার হৃদয়ে আসীন, পূর্ণ রূপে সমর্পিত হয়ে যাওয়া উচিত।"**

এই 'আমি' কে? ঃ-

শ্রী সাইবাবা অনেক বার বুঝিয়েছেন এই 'আমি'টি কে। এই আমিকে খোঁজবার জন্য বেশী দূর যাওয়ার দরকার নেই। তোমার নাম ও চেহারা বাদ দিলে 'আমি' তোমার অন্তঃকরণে এবং সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে চৈতন্যধন স্বরূপ বিদ্যমান এবং এটাই 'আমি'-র স্বরূপ। এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা **তুমি নিজের ও সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে আমাকেই দর্শন করো। যদি তুমি নিত্য এই রূপ অভ্যাস করো তাহলে আমার সর্বব্যপকতা শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারবে এবং আমার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করবে।**

অতএব হেমাডপন্ত পাঠকদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ করছেন যে তাঁরা যেন সকল দেবী-দেবতা, সন্ত ও ভক্তদের শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন। বাবা সর্বদা বলতেন- "**যে অন্যদের দুঃখ দেয় সে আমার হৃদয়কে ব্যথা দেয়, এবং আমাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু যে স্বয়ং কষ্ট সহ্য করে, সে আমার বেশী প্রিয়।**" বাবা সব প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান এবং তাদের সব দিক দিয়ে রক্ষা করেন। সমস্ত প্রাণীদের ভালবাসো, এই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে। এই ধরনের বিশুদ্ধ অমৃতময় স্রোত, তাঁর শ্রীমুখ থেকে সর্বদা প্রবাহিত হত। অতএব যারা প্রেমপূর্বক বাবার লীলাগান করবেন ও সেগুলি ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করবেন, তাঁরা সাইয়ের সাথে অবশ্যই অভিন্নতা প্রাপ্ত করবেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪৫

কাকাসাহেব দীক্ষিতের সন্দেহ এবং আনন্দ রাও-য়ের স্বপ্ন, বাবার শোওয়ার তক্তা।

প্রস্তাবনা ঃ-

গত তিন অধ্যায়ে বাবার মহানির্বাণের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এখন বাবার সাক্ষাৎ স্বরূপ লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর নিরাকার স্বরূপ সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। এ পর্যন্ত, বাবার জীবিতকালের ঘটনা ও লীলাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সমাধিস্থ হওয়ার পরও, অনেক লীলা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, **বাবা অমর এবং আগের মতনই নিজের ভক্তদের সাহায্য করছেন।** বাবার জীবিতকালে তাঁর সংস্পর্শ বা সৎসঙ্গ যারা লাভ করেছিল তাদের ভাগ্যের প্রশংসা কেই বা করতে পারে? তবুও যদি তাদের মধ্যে কারও-কারও ঐন্দ্রিয়ক ও সাংসারিক সুখের প্রতি বৈরাগ্য না এসে থাকে, তাহলে সেটাকে তাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? যে কথাটি সে সময় অনুসরণ করা উচিত ছিল এবং এখনো করা উচিত সেটা হল অনন্য ভাবে বাবার প্রতি ভক্তি। সমস্ত চেতনা, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ও মনকে একাগ্র করে বাবার পূজো বা ধ্যানাদি করার অভিলাষ যদি থাকে তো, সেটা শুদ্ধ মন ও অন্তঃকরণ দিয়ে করা উচিত।

পতিব্রতা স্ত্রীর পতিপ্রেমের উপমা কখনো-কখনো লোকেরা গুরু-শিষ্যর প্রেমের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে। তবুও শিষ্য ও গুরুর প্রেমের তুলনায়, পতিব্রতার প্রেম শুষ্ক এবং অসাড়। মা, বাবা, ভাই বা অন্যান্য

আত্মীয়-স্বজন জীবনের লক্ষ্য (আত্মসাক্ষাৎকার) প্রাপ্ত করাতে কোন সাহায্য করতে পারে না। তার জন্য আমাদের স্বয়ং নিজের পথ অন্বেষণ করে আত্মানুভূতির পথে অগ্রসর হতে হয়। সত্য ও অসত্যের বিবেক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখের ত্যাগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং শুধুমাত্র মোক্ষের ইচ্ছে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। অন্যদের উপর নির্ভর না করে, নিজেদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে হবে। যদি আমরা এই ভাবে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কর্ম করার অভ্যাস করি, তাহলে সহজেই অনুভব করতে পারব যে, এই সংসার নশ্বর ও মিথ্যা। তখন সাংসারিক পদার্থের প্রতি আমাদের আসক্তি উত্তরোত্তর কম হতে থাকবে এবং শেষে তাদের প্রতি বৈরাগ্য সহজেই উৎপন্ন হবে। তার পরই এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে যে, ব্রহ্ম আমাদের গুরু ভিন্ন আর কেউ নন। বরং আসলে তিনি সদ্‌বস্তু (পরমাত্মা) এবং এই দৃশ্যমান জগৎ তাঁরই প্রতিবিম্ব। অতএব এই ভাবে প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে তাঁকেই দর্শন করে, তাঁর পূজো করা উচিত। এই সাম্য ভাবই দৃশ্যমান জগতের প্রতি ঔদাসীন্য জাগরিত করার জন্য মূল মন্ত্র। এই সিদ্ধান্তে বদ্ধপরিকর হয়ে, ব্রহ্ম বা গুরুকে অনন্য ভাবে ভক্তি করলে, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আত্মবোধ অর্জন করা যায়। সংক্ষেপে, গুরুর কীর্তন ও তাঁর ধ্যান আমাদের সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন করার যোগ্যতা প্রদান করে এবং তার ফলেই পরমানন্দ লাভ হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত ঘটনাটি এই তথ্যের উদাহরণ-

কাকাসাহেবের সন্দেহ ও আনন্দরাও-এর স্বপ্ন ঃ-

সকলেই জানে যে বাবা শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিতকে শ্রী একনাথ মহারাজের দুটি গ্রন্থ ১) শ্রীমদ্‌ভাগবৎ ২) ভাবার্থ রামায়ণ রোজ পাঠ করার আদেশ দিয়েছিলেন। বাবার জীবৎকালে কাকাসাহেব এই

গ্রন্থগুলি প্রত্যহ পাঠ করতেন (বাবার দেহরক্ষার পরও সেই অভ্যাস ত্যাগ করেননি)। একবার চৌপাটীতে (বম্বে) কাকাসাহেব ভোরবেলা একনাথী ভাগবৎ পাঠ করছিলেন। মাধবরাও দেশপান্ডে (শামা) এবং কাকা মহাজনীও ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দুজনেই মন দিয়ে পাঠ শ্রবণ করছিলেন। সেই সময় একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় পড়া হচ্ছিল। গ্রন্থের এই অংশটিতে 'নবনাথ' এবং তাঁদের ভক্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ঋষভ বংশের নয় জন নাথ বা সিদ্ধযোগী যেমন- কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন ভাগবৎ ধর্মের মহিমা রাজা জনককে বুঝিয়েছিলেন। রাজা জনক এঁদের প্রত্যেককে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং এঁরা সবাই সন্তোষজনক উত্তর দেন। কবি ভাগবত ধর্ম, হরি ভক্তির বৈশিষ্ট্য, অন্তরিক্ষ মায়া কি, প্রবুদ্ধ মায়া থেকে মুক্তির বিধি, পিপ্পলায়ন পরমব্রহ্মের স্বরূপ, আবিহোত্র কর্মের স্বরূপ, দ্রুমিল পরমাত্মার অবতার ও লীলা, চমস নাস্তিকের মৃত্যুর পর গতি এবং করভাজন কলিকালে ভক্তির পদ্ধতির যথাবিধি বর্ণনা করেন। এই সবের একটাই মানে বেরোয় যে, **কলিযুগে মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র সাধন কেবল হরিকীর্তন বা গুরু চরণের চিন্তন।** গ্রন্থ পাঠ শেষ হলে কাকাসাহেব খুবই নৈরাশ্যপূর্ণ স্বরে মাধররাও এবং অন্য উপস্থিত লোকেদের বলেন- "নবনাথদের ভক্তি-পদ্ধতির গরিমা কে না গায়? কিন্তু সেগুলি অভ্যাস করা কত দুষ্কর? তাঁরা ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত। কিন্তু আমাদের মত মূর্খদের মধ্যে এ ধরনের ভক্তি উৎপন্ন হওয়া কি কখনো সম্ভব হতে পারে? অনেক জন্মের পরও, ঐ রকম ভক্তি প্রাপ্ত হয় না। তাহলে আর মুক্তি পাব কি করে? আমার তো মনে হচ্ছে যে, আমাদের জন্য কোন আশাই

নেই।" মাধবরাওয়ের এই ধরনের নিরাশাবাদী ধারণা ভাল লাগে না। উনি বলেন- "আমাদের খুব সৌভাগ্য যে, আমরা বাবার মত অমূল্য হীরে (গুরু-রত্ন) পেয়েছি। তাই এত নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বাবার প্রতি অচল বিশ্বাস থাকলে, চিন্তার কোন কারণ দেখি না? নবনাথদের ভক্তি হয়ত অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী দৃঢ় এবং প্রবল, কিন্তু আমরাও কি প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্বক ভক্তি করছি না? বাবা অভ্রান্ত ভাবে ও প্রামাণিক ভাবে বলেননি কি যে, শ্রীহরি বা গুরুর নাম জপ করলেই, মুক্তি লাভ হবে? তবে আর ভয় বা চিন্তার কি কারণ থাকতে পারে?" কিন্তু মাধবরাও-য়ের এই আশ্বাসে, কাকাসাহেবের সন্দেহ দূর হয় না। উনি সারাদিন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ও অস্থির হয়ে থাকেন। এই চিন্তাতেই ডুবে ছিলেন যে, কি ভাবে নবনাথদের মত ভক্তি প্রাপ্ত করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে আনন্দরাও পাখার্ডে নামে এক ভদ্রলোক মাধবরাওকে খুঁজতে-খুঁজতে সেখানে এসে পৌঁছন। সেই সময় ভাগবৎ পাঠ চলছিল। শ্রী পাখার্ডেও মাধবরাও-য়ের কাছে গিয়ে বসেন ও ওঁর সাথে ফিস্-ফিস্ করে কথা বলতে শুরু করেন। উনি নিজের স্বপ্ন মাধবরাওকে শোনাচ্ছিলেন। এঁদের কানাঘুষায় পাঠে বাধা পড়ছিল। অতএব কাকাসাহেব পাঠ বন্ধ করে, মাধবরাওকে জিজ্ঞাসা করেন- "কি ব্যাপার, কি কথা হচ্ছে?" মাধবরাও বলেন- "গতকাল তুমি যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলে, এইটি তারই সমাধান। গতকাল বাবা শ্রী পাখার্ডেকে স্বপ্ন দেন, সেটি ওঁর কাছেই শোন। **এতে বলা হয়েছে যে বিশেষ বা অসাধারণ ভক্তির কোন প্রয়োজন নেই। কেবল গুরুকে নমন এবং তাঁর চরণপূজোই যথেষ্ট।"**

সবারই স্বপ্নটি শোনার তীব্র উৎকণ্ঠা হচ্ছিল, বিশেষ করে

কাকাসাহেবের। সবার অনুরোধে, শ্রী পাখার্ডে নিজের স্বপ্নের বিষয়ে বলতে শুরু করেন- "আমি দেখলাম যে, এক গভীর সাগরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কোমর অবধি জল এবং হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই, শ্রী সাইবাবাকে দেখতে পেলাম। তিনি একটি রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে বসে, পা ডুবিয়ে আছেন। এই সুন্দর দৃশ্য ও বাবার মনোহর স্বরূপ দেখে আমার চিত্ত বড়ই প্রসন্ন হয়। এই দর্শন এত বাস্তব ছিল যে, স্বপ্ন বলে আমার মনেই হচ্ছিল না। আমি দেখি যে, মাধবরাওও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি আমায় আবেগপূর্ণ স্বরে বলেন, "আনন্দরাও! বাবার শ্রীচরণ ছোঁও।" আমি উত্তর দিই- "আমিও তো তাই করতে চাই, কিন্তু ওঁর শ্রীচরণ তো জলের নীচে। এবার বলো আমি কি করে নিজের মাথা, ওঁর চরণে রাখি? আমি নিরুপায়!" এই শুনে শামা বাবাকে বলেন- "হে দেব! দয়া করে আপনার পা দুটি জল থেকে তুলুন।" বাবা তক্ষুনি তাঁর পা দুটি তুললেন এবং তৎক্ষণাৎ আমিও তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি। বাবা আমায় আশীর্বাদ করে বললেন - "তোমার কল্যাণ হোক। তুমি পরমার্থ লাভ করবে। ঘাবড়াবার বা চিন্তা করার কোন দরকার নেই।" উনি আমায় এও বলেন- "একটি জরি পাড়ের ধুতি আমার শামাকে দিও, তাতে তোমার খুব লাভ হবে।"

বাবার আদেশানুযায়ী, শ্রী পাখার্ডে একটা ধুতি এনেছিলেন এবং কাকাসাহেবকে অনুরোধ করেন- "দয়া করে এটি মাধবরাওকে দিন।" কিন্তু মাধবরাও সেটি নিতে রাজী হন না।

উনি বলেন- "বাবা যদি আমাকে গ্রহণের জন্য কোন আভাস বা ইঙ্গিত দেন তবেই আমি এটি নেব, নাহলে নয়।" একটু তর্কাতর্কির পর কাকাসাহেব দৈব-আদেশসূচক চিরকূট বার করে, এই সমস্যার

সমাধান করা স্থির করেন। কাকাসাহেবের নিয়ম ছিল যে যখনই উনি কোন দ্বিধাসংশয়ের সম্মুখীন হতেন তখন দুটি চিরকুটের উপর 'স্বীকার' 'অস্বীকার' লিখে তার থেকে একটা তুলিয়ে নিতেন। তাতে যা উত্তর পেতেন, সেই মতই কাজ করতেন। এবারও, দুটো চিরকুট লিখে বাবার ছবির সামনে রাখা হল এবং একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে তোলানো হল। 'স্বীকার' লেখা কাগজটি ওঠায়, মাধবরাওকে ধুতিটি গ্রহণ করতে হল। এই ভাবে আনন্দরাও এবং মাধবরাও সন্তুষ্ট হন এবং কাকাসাহেবের সন্দেহও দূর হয়। ঘটনাটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, **অন্যান্য সাধু-সন্তদের বক্তব্যকে শ্রদ্ধা করা উচিত। নিজের মা অর্থাৎ গুরুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, তাঁর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা, অতি আবশ্যক। আমাদের কল্যাণের বিষয়ে অন্য লোকেদের চেয়ে তাঁর চিন্তা থাকে বেশী।**

বাবার নিম্নলিখিত কথাগুলি হৃদয়ংগম করে নাও - **"এই বিশ্বে অসংখ্য সাধু-সন্ত রয়েছেন। কিন্তু নিজের পিতাই (গুরু) আসল পিতা (আসল গুরু)। অন্যরা যতই-মধুর উপদেশ দিন, নিজের গুরুর উপদেশ ভোলা উচিত নয়।** এর মর্মার্থ এই যে, প্রাণ দিয়ে গুরুকে ভালবাসো, তাঁর শরণে যাও এবং তাঁকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে প্রণাম করো। তবেই তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার সামনে ভবসাগরের অস্তিত্ব ঠিক তেমন, যেমন সূর্য্যের সামনে অন্ধকার।"

বাবার শয়নের জন্য কাঠের তক্তা -

বাবা নিজের জীবনের পূর্বার্দ্ধে, একটা কাঠের তক্তার উপর শুতেন।

সেই তক্তাটি চার হাত লম্বা এবং এক হাত চওড়া ছিল, যার চার কোণায় চারটি মাটির প্রদীপ জ্বলতো। পরে বাবা সেটি টুকরো-টুকরো করে ফেলে দেন (এর বর্ণনা দশম অধ্যায়ে করা হয়েছে)। এক সময় বাবা ঐ তক্তাটির মাহাত্ম্য কাকাসাহেবকে বর্ণনা করে শোনাচ্ছিলেন। কাকাসাহেব সব শুনে বলেন- "এখনো যদি আপনার তক্তায় শুতে ভালো লাগে, তাহলে মস্‌জিদে একটা অন্য তক্তা ঝুলিয়ে দিচ্ছি। আপনি স্বচ্ছন্দে তার উপর শুতে পারেন।" তখন বাবা বলেন- "মহালসাপতিকে নীচে ছেড়ে, এখন আর আমি উপরে শুতে চাই না।" কাকাসাহেব বলেন- "যদি অনুমতি দেন, তাহলে মহালসাপতির জন্য আমি আরেকটা তক্তা ঝুলিয়ে দিচ্ছি।"

বাবা বলেন- "সে তক্তার ওপর কি করে শুতে পারবে? এ কি অত সহজ কাজ? অনেক গুণ থাকলে তবেই পারা যায়। যে খোলা চোখে ঘুমোতে পারে, সেইই এর যোগ্য পাত্র। আমি ঘুমোবার সময় প্রায়ই মহালসাপতিকে আমার পাশে বসে, আমার বুকের উপর হাত রেখে, হরি নাম জপ হচ্ছে কি না লক্ষ্য করতে বলি। যদি আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে, তাহলে যেন তক্ষুনি জাগিয়ে দেয়। কিন্তু এত টুকুও সে করতে পারে না। সে নিজেই ঝিমুতে থাকে। যখন ভগতের হাত আমার ভারী মনে হয়, তখন আমি জোরে ডেকে উঠি 'ও ভগত।' তখন ও ঘাবড়ে গিয়ে চোখ খোলে। যে মাটিতেই ভালভাবে বসতে শুতে পারে না, যার আসন স্থির নয় এবং যে নিদ্রার দাস, সে কি ঝোলান তক্তায় শুতে পারবে?" অনেক সময়ই বাবা ভক্তদের বলতেন- "আমি আমার মত, সে তার মত।"

।। श्री साईनाथार्पनमस्तु। शुभम् भवतु।।

অধ্যায় - ৪৬

বাবার গয়া যাত্রা, দুটি ছাগলের পূর্বজন্মের কাহিনী।

এই অধ্যায়ে শামার কাশী, প্রয়াগ ও গয়া যাত্রার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, বাবা (ছবিরূপে) কেমন করে সেখানে এঁদের আগেই পৌঁছেছিলেন, সে কথা বলা হয়েছে এবং দুটি ছাগলের গত জন্মের ইতিহাসের বিষয়ে লেখা হয়েছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

হে সাই! আপনার শ্রীচরণ ধন্য এবং তার স্মৃতি কত আনন্দদায়ক। আপনার ভবভয়বিনাশকারী স্বরূপও ধন্য, যার প্রভাবে কর্মবন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। যদিও এখন আর আমরা আপনার সগুণ স্বরূপের দর্শন পাই না, তবুও আপনি আপনার শ্রীচরণের শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দেন। আপনি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ শক্তি দিয়ে কাছের বা দূরের ভক্তদের নিজের কাছে টেনে, তাদের এক স্নেহময়ী মায়ের মতন জড়িয়ে ধরেন। হে সাই! ভক্তরা জানে না আপনার বাসস্থান কোথায়। কিন্তু আপনি এমন কৌশলে তাদের প্রেরণা দেন যে, মনে হয় যেন আপনার অভয়হস্ত ওদের মাথার উপর সর্বদাই রয়েছে। এইটি আপনারই কৃপা দৃষ্টির পরিণাম যে ওরা এক অজ্ঞাত সাহায্য সর্বদাই পায়। অহংকারের বশবর্ত্তী হয়ে মহাবিদ্বান ও চতুর পুরুষও, এই ভবসাগরের পাঁকে তলিয়ে যায়। কিন্তু হে সাই! আপনি কেবল নিজের শক্তির সাহায্যে অসহায় ও সরল ভক্তদের এই পাঁক থেকে বার করে তাদের রক্ষা করেন। পর্দার আড়ালে থেকে, আপনিই

সব খেলা খেলছেন। তবুও এমন অভিনয় করেন যেন সেগুলির সাথে আপনার কোন সর্ম্পকই নেই। কেউই আপনার সম্পূর্ণ জীবনগাথা জানতে পারেনি। সে জন্য আমাদের পক্ষে সব চেয়ে ভালো পথ হচ্ছে- অনন্য ভাবে আপনার শ্রীচরণে সমর্পিত হয়ে, পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, একমাত্র আপনারই নাম স্মরণ করা। আপনি নিষ্কাম ভক্তদের সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করে, তাদের পরমানন্দ দেন। আপনার মধুর নামের উচ্চারণেই, ভক্তদের মধ্যে রাজসিক ও তামসিক গুণ হ্রাস হয়ে, সাত্বিক ও ধার্মিক গুণের বিকাশ হয়। তার সাথে-সাথেই ওরা ধীরে-ধীরে বিবেক, বৈরাগ্য ও জ্ঞান লাভ করে। তখন আত্মস্থিত হয়ে গুরুর সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং এরই আরেক অর্থ হচ্ছে, গুরুর প্রতি অনন্য ভাবে শরণাগত হওয়া। এর নিশ্চিত প্রমাণ শুধু এটাই যে, তখন আমাদের মন স্থির এবং শান্ত হয়। এই শরণাগতি, ভক্তি ও জ্ঞানের মাহাত্ম্য অদ্বিতীয়। এর ফলেই ক্রমে ক্রমে আসে শান্তি, বৈরাগ্য, যশ ও মুক্তি। যদি বাবা তাঁর ভক্তদের উপর অনুগ্রহ করেন, তাহলে তিনি সর্বদা তাদের কাছেই থাকেন। তাঁর ভক্তরা যেখানেই যাক না কেন, তিনি কোন-না-কোন রূপে আগে থেকেই সেখানে পৌঁছে যেতেন। নীচের ঘটনাটি তারই উদাহরণ।

গয়া যাত্রা ঃ-

বাবার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক বছর পর কাকাসাহেব দীক্ষিত নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাপুর নাগপুরে 'উপনয়ন' সংস্কার করাবেন স্থির করেন। প্রায় সেই সময়ই নানাসাহেব চাঁদোরকরও নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ অনুষ্ঠানের দিন স্থির করেন। দীক্ষিত ও চাঁদোরকর দুজনেই শিরডী এসে বাবাকে আন্তরিক ভাবে নিমন্ত্রণ করেন। বাবা তাঁর প্রতিনিধি শামাকে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু যখন ওঁরা বাবাকেই

স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তিনি উত্তর দেন- "বেনারস ও প্রয়াগ পেরিয়ে যাওয়ার পর আমি শামার আগেই পৌঁছে যাবো।" পাঠকগণ, এই শব্দগুলি একটু মনে রাখবেন কারণ, এইগুলি বাবার সর্বজ্ঞতা বোঝাবে ।

বাবার অনুমতি নিয়ে শামা এই উৎসবগুলিতে যোগদান দিতে, প্রথমে নাগপুর, গোয়ালিয়র এবং তারপর কাশী, প্রয়াগ ও গয়া যাওয়া স্থির করেন। আপ্পা কোতে শামার সঙ্গে যাওয়া ঠিক করেন। প্রথমে ওঁরা নাগপুর পৌঁছান। সেখানে কাকাসাহেব দীক্ষিত, শামাকে হাতখরচের জন্য দুশো টাকা দেন। সেখান থেকে দুজনে গোয়ালিয়র যান। ওখানে নানাসাহেব চাঁদোরকর ১০০ টাকা ও তাঁর এক আত্মীয় শ্রী জাঠর ১০০ টাকা শামাকে দেন।

এরপর ওঁরা কাশী পৌঁছান, যেখানে জাঠরের 'লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে' এবং অযোধ্যাতে 'শ্রীরাম মন্দিরে' ওঁদের সুন্দর আদর-আপ্যায়ণ করেন শ্রী জাঠরের ম্যানেজার। শামা ও কোতে অযোধ্যাতে ২১ দিন এবং কাশীতে (বেনারসে) দু-মাস থেকে, গয়ার জন্য রওনা হন। গয়াতে নাকি খুব 'প্লেগ' হচ্ছে এই খবর ট্রেনে পেয়ে, এঁদের একটু চিন্তা হয়। তবুও রাত্তিরে গয়া স্টেশনে নেমে, ওঁরা একটা ধর্মশালায় গিয়ে ওঠেন। সকালবেলা গয়ার পূজারী (পান্ডা), যে যাত্রীদের থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করত, ওঁদের কাছে এসে বলে- "সব যাত্রীরা চলে গেছে, তাই আপনারাও এবার তাড়াতাড়ি করুন।" শামা তখন ওকে জিজ্ঞাসা করেন- "এখানে কি প্লেগ ছড়িয়েছে?" তাতে পাণ্ডা উত্তর দেয়- "না, আপনারা নির্বিঘ্নে আমার বাড়ীতে এসে, আসল পরিস্থিতিটা দেখতে পারেন।" এরপর ওঁরা ওর বাড়ী যান।

বাড়ী তো নয়, এক বিশাল ভবন। সেখানে যাত্রীদের বিশ্রাম করার জায়গা ছিল। শামাকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়। থাকার জায়গার সুবন্দোবস্ত দেখে, শামার খুব ভালো লাগে। কিন্তু বাড়ীর সামনে এবং ঠিক মাঝখানে বাবার এক বড় প্রতিকৃতি দেখে, শামা আনন্দে ও আবেগে আত্মহারা হয়ে যান। বাবার শব্দগুলি মনে পড়ে যায়- "আমি কাশী ও প্রয়াগ পেরিয়ে যাওয়ার পর, শামার আগেই পৌঁছে যাবো।" শামার চোখ থেকে জল পড়তে থাকে। ভাবাবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে গলা রুদ্ধ হল। কাঁদতে-কাঁদতে ওঁর মুখ থেকে কোন কথা বেরোয় না। শামার এইরূপ অবস্থা দেখে পাণ্ডা ভাবে- "মনে হয় প্লেগের ভয়ে কাঁদছে।" কিন্তু শামা ওর কল্পনার বিপরীতই প্রশ্ন করে বসেন- "বাবার এই ছবিটি তুমি কোথায় পেলে?" তখন সে উত্তর দেয়- "আমার মনমাডে ও পূন্তাম্বেতে দু-তিন শো দালাল কাজ করে, গয়া-যাত্রীদের সুখ-সুবিধা দেখবার জন্য। তাদের কাছেই, শিরডীর সাই মহারাজের খ্যাতির কথা শুনতে পাই। প্রায় বারো বছর আগে, আমি শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করি এবং ওখানেই শামার বাড়ীতে টাঙ্গানো এই ছবিটি আমায় আকর্ষিত করে। তখন বাবার নির্দেশ অনুযায়ী, শামা আমায় যে ছবিটা উপহার দেন, এটি সেই ছবি।" শামার তখন সব কথা মনে পড়ে। গয়ার পাণ্ডা যখন জানতে পারল যে, ইনি সেই শামা যিনি তাকে এই চিত্রটি দিয়ে অনুগৃহীত করেছিলেন এবং আজ তার বাড়ীতে অতিথি হয়ে এসেছেন, তখন ওর আনন্দের সীমা রইল না। দুজনেই এই সাক্ষাতে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। এরপর সে শামাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাল। সে ছিল একজন ধনীলোক। নিজে পাল্কীতে চড়ে ও শামাকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে, শহর ভ্রমণ করায় এবং সব রকম ভাবে শামার সুখ-সুবিধের খেয়াল রাখে। গল্পটির

মূলতত্ত্ব এই যে, বাবার কথা সর্বদাই সত্য হত। তাঁর নিজের ভক্তদের প্রতি তো স্নেহ ছিলই, তাছাড়া তিনি সব প্রাণীদেরই এইরূপ ভালবাসতেন এবং তাদের নিজেরই স্বরূপ মনে করতেন। নীচের গল্পটিতে এই কথারই আভাস পাওয়া যাবে।

দুটি ছাগল ঃ-

একবার লেন্ডী বাগান থেকে ফেরার সময়, বাবা এক পাল ছাগল দেখতে পান। তাদের মধ্যে দু'টি ছাগলের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বাবা গিয়ে তাদের উপর হাত বোলান এবং ৩২ টাকায় দুটিকে কিনে নেন। বাবার এই বিচিত্র ব্যবহার দেখে, ভক্তরা খুব অবাক হয়। ওদের মনে হয় এই লেনদেনে বাবা ঠকে গেছেন, কারণ একটা ছাগলের দাম, সেই সময় তিন-চার টাকার চেয়ে বেশী ছিল না। ঐ দু'টি ছাগল আট টাকায় সহজেই পাওয়া যেতে পারত।

বাবাকে তাই এ ব্যাপারে খানিক কথা শুনতে হল। কিন্তু বাবা শান্ত হয়ে বসে রইলেন। এবার শামা ও তাত্য়া ছাগল কেনার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বাবা উত্তর দেন- "আমার কোন ঘর-সংসার বা স্ত্রী-পুত্র তো নেই, যাদের জন্য টাকা জমিয়ে রাখতে হবে।" তারপর তিনি চার সের ডাল কিনে ছাগল দুটিকে খাওয়ান। খাওয়ানো-দাওয়ানো শেষ হলে, তিনি ছাগল দু'টিকে তাদের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেন। এরপর তাদের পূর্বজন্মের কাহিনী বলেন- "শামা, তাত্য়া! তোমরা ভাবছ আমি ঠকে গেছি? কিন্তু তা নয়, এদের কাহিনী শোন। গত জন্মে এরা সহোদর ভাই ছিল এবং প্রথমে এদের মধ্যে পরস্পর খুব ভাব-ভালবাসা ছিল। কিন্তু পরে, একজন অন্যজনের কট্টর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বড় ভাই অলস প্রকৃতির ছিল। কিন্তু ছোট

ভাই ছিল খুবই পরিশ্রমী এবং যথেষ্ট ধন উপার্জন করেছিল। তাই বড় ভাই ছোট ভাইকে হিংসে করত এবং তাকে মেরে তার ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা স্থির করে। ওরা নিজেদের সম্বন্ধের কথা ভুলে, বিশ্রী ভাবে লড়াই-ঝগড়া করত। বড় ভাই অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু ছোট ভাইকে মারতে পারে না। শেষে একদিন ছোট ভাইয়ের মাথায় লাঠি দিয়ে মারে। তখন ছোট ভাইও কুড়ুল দিয়ে বড় ভাইয়ের মাথা ফাটাল। দুজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল। তারপর নিজেদের কর্ম অনুসারে, ওরা ছাগল হয়ে জন্মায়। ওরা যখন আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমার ওদের পূর্ব ইতিহাস মনে পড়ায় দয়া হয়। তাই ওদের কিছু খাইয়ে দাইয়ে, একটু আনন্দ দিতে ইচ্ছে হয়। কিছু টাকা তাই খরচ হয়ে গেল। আর তোমরা সেজন্য আমায় বকছ। তোমাদের এই লেনদেন ভালো লাগল না বলে আমি ওদের মেষ পালককে ফেরত দিয়ে দিলাম।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪৭

পূর্বজন্ম ঃ বীরভদ্রাপ্পা এবং চেনবাসাপ্পার (সাপ ও ব্যাঙ্গ) কাহিনী

গত অধ্যায়ে দুটি ছাগলের পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়তে আরো কয়েকটি পূর্বজন্মের স্মৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

হে ত্রিগুণাতীত জ্ঞানাবতার শ্রী সাই! তোমার মুখ মণ্ডল কত সুন্দর! হে অন্তর্যামী! তোমার শ্রীমুখের প্রভা ধন্য। সেটি ক্ষণিকের জন্য দেখলে পূর্বজন্মের সমস্ত দুঃখ নাশ হয়ে সুখের দ্বার খুলে যায়। কিন্তু হে আমার প্রিয় শ্রী সাই! যদি তুমি নিজের স্বাভাবিক ও অহেতুক কৃপাদৃষ্টির আশীর্বাদ দাও, তবেই এরকমটি হওয়া সম্ভব। তোমার দৃষ্টিমাত্রেই আমাদের কর্ম-বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং আমরা পরমানন্দ অনুভব করি। গঙ্গায় স্নান করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু গঙ্গামাও সন্তদের আগমনের জন্য সর্বদা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করেন যে কবে তাঁরা এসে নিজেদের চরণধূলি দিয়ে তাঁকে পবিত্র করবেন। শ্রী সাই তো সন্ত চূড়ামণি! এবার তাঁরই শ্রীমুখ থেকে চিত্তশুদ্ধকারী একটি কাহিনী শুনুন।

সাপ এবং ব্যাঙ ঃ-

শ্রী সাইবাবা বলতে শুরু করেন - "একদিন সকালবেলা প্রায় ৮টা নাগাদ জলখাবারের পর, আমি বেড়াতে বেরোই। হাঁটতে-হাঁটতে একটা ছোট নদীতীরে এসে পৌঁছাই। আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম,

তাই ওখানেই একটু বিশ্রাম করতে বসি। একটুক্ষণ পর স্নান করি। তখন গিয়ে আমার ক্লান্তি দূর হয় এবং আমি খানিকটা আরাম পাই। ঐ জায়গাটির কাছেই একটা গরুর গাড়ীর যাওয়ার মত সরু রাস্তা ছিল। তার দুদিকে ঘন গাছ। মৃদু মৃদু বাতাস বইছিল। আমি ছিলিম ভরতে যাচ্ছি, এমন সময় একটা ব্যাঙের কর্কশ আওয়াজ শুনতে পাই। ঠিক সেই সময় একটি পথিক সেখানে এসে পৌঁছয় এবং আমাকে প্রণাম করে, আমার কাছে এসে বসে। এরপর আমায় ওর বাড়ীতে গিয়ে খেতে ও বিশ্রাম করতে অনুরোধ করে। সে নিজেই ছিলিমটি ধরিয়ে আমায় দিল। এমন সময় ব্যাঙের ডাক শুনে, সে তার রহস্য জানবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। আমি ওকে জানাই- "একটা ব্যাঙ বিপদে পড়েছে এবং নিজের পূর্বজন্মের কর্মের ফল ভুগছে। **পূর্বজন্মের কু-কর্মের ফল এই জন্মে ভুগতেই হয়। অতএব এখন চেঁচিয়ে কিছু লাভ হবে না।"** এরপর লোকটি তামাক টেনে ছিলিমটি আমাকে দিয়ে বলে- "একটু দেখি তো ব্যাপারটা কি?" এই বলে সে উঠে দাঁড়ায়। তখন আমি ওকে জানাই যে, একটা বড় সাপ ঐ ব্যাঙটাকে নিজের মুখে ধরে রেখেছে, তাই ও চেঁচাচ্ছে। দুজনেই পূর্বজন্মে বেজায় বদমাস ছিল। তাই এই জন্মে নিজেদের কর্মের ফল ভুগছে। আগন্তুক ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে যে, সত্যি-সত্যি একটা বিরাট সাপ একটা বড় ব্যাঙকে মুখে ধরে রেখেছে। ও ফিরে এসে আমায় জানায় যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সাপটা ব্যাঙটাকে গিলে ফেলবে। আমি বললাম- "না, তা কখনোই হবে না। আমি ওর সংরক্ষক পিতা এবং এই সময় এইখানে উপস্থিত আছি। তবে সেই সাপের কি ক্ষমতা আছে যে, সে ব্যাঙটাকে গিলে ফেলে? আমি কি শুধু শুধুই এখানে বসে আছি? এবার দেখো, আমি কি

করে ওকে রক্ষা করি।" আবার ছিলিমে টান দিয়ে আমরা সেই স্থানে যাই। আগন্তুক ভয় পেয়ে সাপটির খুব কাছে যেতে আমায় মানা করে। আমি ওর কথায় কান না দিয়ে, এগিয়ে গেলাম এবং দুজনকে বললাম- "আরে, বীরভদ্রাপ্পা, তোমার শত্রু ব্যাঙ হয়ে জন্মে উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে যায়নি কি? ও ব্যাঙ হয়ে আর তুমি সাপ হয়ে জন্মে, এখনও তার শত্রুতা করছ? কি লজ্জার কথা! যাও, ঘৃণা ছেড়ে শান্তিতে থাক গে।' এই কথা শুনে সাপটা তাড়াতাড়ি ব্যাঙটাকে ছেড়ে, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্যাঙটাও লাফিয়ে পালায় এবং ঝোপে লুকিয়ে যায়। ঐ পথিকটি এসব দেখে খুবই অবাক হয়। সে বুঝে উঠতে পারে না যে, আমার কথাগুলি শুনে সাপটা ব্যাঙটাকে ছেড়ে দিল কেন এবং বীরভদ্রাপ্পা কে? ওদের শত্রুতার কারণ কি ছিল? এই সব প্রশ্নগুলি ওর মাথায় ঘুরছিল। আমি ওর সঙ্গে আবার ঐ গাছটার নীচে ফিরে এলাম। দুজনে মিলে খানিকটা ছিলিম টেনে নিয়ে, আমি তখন ওর কাছে এর সমস্ত রহস্য প্রকাশ করি -

"আমার বাড়ীর থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূরে, একটা পবিত্র স্থানে মহাদেবের একটি মন্দির ছিল। মন্দিরটির অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থা দেখে স্থানীয় লোকেরা সেটি মেরামত করাবার জন্য কিছু চাঁদা তোলে। বেশ কিছু টাকা সংগ্রহ হয়ে যায় এবং সেখানে নিত্য পূজোর ব্যবস্থা করে মন্দির সংস্কারের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। একজন ধনী ব্যক্তিকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে তাকে সমস্ত কাজের ভার দেওয়া হয়। তার কাজ ছিল খরচাপাতির যথোচিত বিবরণ রেখে, সততার সঙ্গে হিসেব রাখা। কিন্তু শেঠ ছিল এক নম্বরের কৃপণ। সে মেরামতের কাজে খুবই কম টাকা খরচ করে। তাই কাজও সেই অনুপাতে হয়। সব টাকা সে আত্মসাৎ করে বসল, নিজের কাছ

থেকে একটা পয়সাও খরচ করল না। ওর কথাবার্তা ছিল খুব মিষ্টি। কাজ যে কিছুই এগোচ্ছে না- এ প্রশ্ন উঠলেই সে মিষ্টি কথায় লোকেদের ভুলিয়ে দিত। কাজটা আগের মতই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লোকেরা আবার সংগঠিত হয়ে, ওর কাছে গিয়ে বলে- 'শেঠ সাহেব, দয়া করে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন। আপনি চেষ্টা না করলে, এই কাজটি শেষ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব আপনি আবার পরিকল্পনাটি তৈরী করুন। আমরা আরো চাঁদা তুলে আপনাকে দেব।" ওরা আবার চাঁদা তুলে শেঠকে দেয়। সে টাকাটা তো নিয়ে নেয়। কিন্তু আগের মতই চুপচাপ বসে রইল। কিছুদিন পর ওর স্ত্রীকে মহাদেব স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন- "ওঠো, মন্দিরের চূড়াটি তৈরী করাও। তুমি যতটা টাকা এই কাজের জন্য ব্যয় করবে তার শতগুণ আমি তোমায় দেব।" এই স্বপ্নের কথা ও নিজের স্বামীকে বলে। শেঠ ভয় পেয়ে, চিন্তায় পড়ে যায়। এই রকম কাজে তো অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। তাই সে এ কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে- "এ নিছক স্বপ্ন, একবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি সেরকম হত, তাহলে মহাদেব আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে আমাকেই তো আদেশ দিতে পারতেন। আমি কি তোমার থেকে বেশী দূরে ছিলাম? এই স্বপ্ন শুভ নয়- এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষা-কষি পাকিয়ে তুলবে। তাই তুমি এ বিষয়ে চুপ থাকো। ভগবান অনিচ্ছায় দেওয়া দামী বস্তু বা অজস্র ধনের আশা কখনোই করেন না। তিনি তো প্রেম ও ভক্তি সহকারে দেওয়া একটা তুচ্ছ তামার পয়সাই গ্রহণ করে নেন।" মহাদেব আবার স্ত্রীটিকে স্বপ্ন দেন- "তুমি তোমার স্বামীর নিরর্থক কথার ও তার সঞ্চিত টাকার উপর ভরসা কোর না এবং ওকে মন্দির মেরামতের কাজেও জোর দিও না। আমি তো শুধু তোমারই প্রেম ও ভক্তি চাই। তোমার যতটা খরচ করতে ইচ্ছে হয়, নিজের সামর্থ হিসেবে করো।" স্ত্রীটি

তখন তার বাবার দেওয়া গয়নাগুলো বিক্রী করবে ঠিক করে। এইবার কৃপণ শেঠ অশান্ত হয়ে ওঠে। সে ভগবানকেও ঠকাতে উদ্যত হয়। সে কেবল এক হাজার টাকায় স্ত্রীর সমস্ত গয়না নিজেই কিনে নেয় এবং একটা অনুর্বর জমি মন্দিরের জন্য দিয়ে দেয়। ওর স্ত্রীও চুপচাপ সেটা স্বীকার করে নেয়। শেঠ যে জমির টুকরোটি দেয়, সেটা ওর নিজের ছিল না। একটি গরীব মহিলা 'দুবকী', সেটা শেঠের কাছে দু'শো টাকায় বন্ধক দিয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত ঋণ শোধ করে জমি ছাড়াতে পারেনি। ঐ ধূর্ত কৃপন নিজের স্ত্রী, 'দুবকী' ও ভগবানকেও ঠকালো। জমিটি ছিল একবারে বন্ধ্যা- বর্ষা ঋতুতেও কোন ফসল হত না। পরে সেটা মন্দিরের পুরোহিতের হাতে দেওয়া হয় এবং সে ওটা পেয়ে খুবই খুশী হয়।"

"কিছুদিন পর একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। ভয়ানক ঝড় ওঠে এবং প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। ঐ কৃপণের বাড়ীতে বাজ পড়ে। ফলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মারা যায়। দুবকীও শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। পরের জন্মে, ঐ কৃপণ মথুরার এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মায় এবং ওর নাম বীরভদ্রাপ্পা রাখা হয়। ওর স্ত্রী ঐ মন্দিরের পুরোহিতের বাড়ীতে মেয়ে হয়ে জন্মায় এবং ওর নাম 'গৌরী' রাখা হয়। "দুবকী" পুরুষ হয়ে মন্দিরের সেবাইতের পরিবারে জন্মায় এবং ওর নাম হল চেনবাসাপ্পা। পুরোহিত আমার বন্ধু ছিল এবং প্রায় আমার কাছে আসত, গল্পগুজব করত এবং আমার সঙ্গে তামাক টানত। ওর মেয়ে গৌরীও আমার ভক্ত ছিল। মেয়েটি আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠল। ওর বাবা ওর জন্য সৎপাত্রের খোঁজ করছিল। আমি ওকে বলি- "চিন্তা করার দরকার নেই। বর নিজেই তোমার বাড়ীতে মেয়ের খোঁজে আসবে।" কিছুদিন পরই বীরভদ্রাপ্পা নামে একটি যুবক ভিক্ষে চাইতে-চাইতে ওর বাড়ীতে এসে পৌঁছয়। আমার সম্মতিতে, গৌরীর বিয়ে ওর সাথে হয়ে গেল।

প্রথমে ও আমার ভক্ত ছিল, কিন্তু পরে সে কৃতঘ্ন হয়ে গেল। এই নতুন জন্মেও ওর ধন-তৃষ্ণা মেটেনি। ও আমার কাছে ব্যবসা ইত্যাদির বিষয়ে পরামর্শ চায়, কারণ ও তখন বিবাহিত। এই সময়ই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। হঠাৎ সমস্ত জিনিষের দাম বেড়ে যায়। গৌরীর ভাগ্যক্রমে, জমিটির দাম বেড়ে যায় এবং পুরো ভাগটা এক লক্ষ টাকায় (গহনার দামের ১০০ গুণ) বিক্রী হয়ে যায়। এই ঠিক করা হয় যে, ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং ২০০০ টাকা প্রতি বছর কিস্তিতে দেওয়া হবে। সবাই এই বিষয়ে একমত হল। কিন্তু সেই টাকার ভাগের ব্যাপারে ঝগড়া বাঁধল। আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলে, আমি বলি- "এই জমিটি তো ভগবানের এবং সেটি পুরোহিতকে দেওয়া হয়েছিল। এর কর্ত্রী তো গৌরীই এবং এক পয়সাও ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে খরচ করা উচিত নয়। ওর স্বামীর এর উপর কোন অধিকার নেই।' আমার কথা শুনে বীরভদ্রাপ্পা আমার উপর বেজায় চটে উঠল। সে বলে- "তুমি গৌরীকে ফুসলিয়ে, ওর টাকা হাতিয়ে নিতে চাও।" এই কথা শুনে, আমি ভগবানের নাম নিয়ে চুপ করে বসে যাই। বীরভদ্রাপ্পা নিজের বৌকে মারেও। গৌরী দুপুর বেলা এসে আমায় বলে- "আপনি ওদের কথায় দুঃখ পাবেন না। আমি তো আপনার মেয়ে। আমার উপর কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।" ও যখন এই ভাবে আমার শরণ নিল, তখন আমি ওকে কথা দিই যে, আমি সাত সমুদ্র পার করেও তাকে রক্ষা করব। সেই রাতেই গৌরী স্বপ্ন দেখল। মহাদেব ওকে বলছেন- "এই সব সম্পত্তি তোমারই এবং এর থেকে কাউকে কিছু দিও না। চেনবাসাপ্পার সাথে পরামর্শ করে, কিছু টাকা মন্দিরের জন্য খরচ করো। যদি অন্য কোন ব্যাপারে খরচ করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মস্‌জিদে গিয়ে বাবার (স্বয়ং আমি) সাথে পরামর্শ করো।" গৌরী নিজের স্বপ্নের কথা আমায় বলে এবং

আমি ওকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে বলি- "মূল রাশি তুমি নাও ও সুদের অর্দ্ধেক ভাগ চেনবাসাপ্পাকে দাও। বীরভদ্রাপ্পার এর সাথে কোন সম্বন্ধ নেই।" আমরা যখন এই সব কথা বলছিলাম, ঠিক সেই সময় বীরভদ্রাপ্পা ও চেনবাসাপ্পা ঝগড়া করতে-করতে সেখানে এসে পৌঁছয়। আমি দুজনকেই শান্ত করতে চেষ্টা করি এবং গৌরীর স্বপ্নের কথাও উল্লেখ করি। কিন্তু বীরভদ্রাপ্পা রাগে পাগল হয়ে চেনবাসাপ্পাকে টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেলার হুমকী দেয়। চেনবাসাপ্পা একটু ভীতু প্রকৃতির লোক ছিল। সে আমার পা ধরে তাকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করে। তখন আমি শত্রুর হাত থেকে ওকে বাঁচিয়ে নিই। কিছুকাল পর দু-জনেই মারা যায়। বীরভদ্রাপ্পা সাপ হয়ে এবং চেনবাসাপ্পা ব্যাঙ হয়ে জন্মায়। চেনবাসাপ্পার ডাক শুনে এবং পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আমি নিজের কর্তব্য পালন করি। **বিপদের সময় ভগবান দৌড়ে নিজের ভক্তের কাছে যান। তিনি আমায় এখানে পাঠিয়ে চেনবাসাপ্পাকে বাঁচিয়ে নিলেন। এই সব ঐশ্বরিক লীলা।"**

শিক্ষা ঃ-

এই কাহিনীর শিক্ষা হল যে- যে যেরকম কর্ম করে সে সেরকমই ফল পায়। আগের ঋণ এবং অন্য লোকেদের সাথে দেওয়া-নেওয়া যতক্ষন শোধ না হয়, ততক্ষন নিস্তার নেই। ধনতৃষ্ণা মানুষের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষে এরই জন্য বিনাশ ঘটে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪৮

সদ্‌গুরুর লক্ষণ, ভক্তদের আপদ নিবারণ - ১) শ্রী শেওয়াডে ২) শ্রী সপ্টণেকর ও শ্রীমতী সপ্টণেকর ৩) সন্ততি দান।

অধ্যায়টি শুরু করার আগে কেউ হেমাডপন্তকে প্রশ্ন করে যে শ্রী সাইবাবা গুরু ছিলেন না সদ্‌গুরু। এর উত্তরে হেমাডপন্ত সদ্‌গুরুর ব্যাখ্যা এই ভাবে করেছেন-

সদগুরুর লক্ষণ ঃ-

যে বেদ বেদান্ত এবং ছটি শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করে, ব্রহ্মবিষয়ক মধুর ব্যাখ্যা দিতে পারে, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে সহজে ধ্যান মুদ্রায় বসে মন্ত্রোপদেশ দেয়, নিশ্চিত সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করার আদেশ দিয়ে, কেবল নিজের বাক্‌চাতুর্য্যের সাহায্যে জীবনের লক্ষ্যের দর্শন করায় কিন্তু যে নিজে আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করেনি, সে সদ্‌গুরু নয়। বরং যিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে লৌকিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি ঔদাসীন্য উৎপন্ন করে, আমাদের আত্মানুভূতির রসাস্বাদন করান এবং যিনি নিজের ভক্তদের কার্যকরী ও প্রত্যক্ষ (আত্মানুভূতি) করিয়ে দেন, তাঁকেই সদ্‌গুরু বলা হয়। যার নিজেরই আত্মজ্ঞান হয়নি, শিষ্যদের তা দেবেন কি করে? সদ্‌গুরু স্বপ্নেও নিজের শিষ্যদের কাছে কোন সেবা আশা করেন না, বরং স্বয়ং ওদের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। তিনি এও কখনো মনে করেন না যে, আমি একজন মহান লোক এবং আমার শিষ্য তুচ্ছ। তিনি শিষ্যকে নিজের মতই (বা ব্রহ্মস্বরূপ) মনে করেন।

সদ্‌গুরুর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর হৃদয়ে সর্বদা পরম শান্তি বিদ্যমান থাকে। তিনি কখনো অস্থির বা ব্যাকুল হন না এবং নিজের জ্ঞানের বিষয়ে লেশমাত্র গর্ব রাখেন না। তাঁর কাছে রাজা-কাঙ্গাল, ছোট-বড় সব সমান।

হেমাডপন্ত বলেন- "আমার গত জন্মের সঞ্চিত পূণ্যফলেই, শ্রী সাইবাবা মত সদ্‌গুরুর দর্শন ও তাঁর কৃপা লাভ করার সুযোগ পেয়েছি। বাবা নিজের যুবাবস্থায় ছিলিম ছাড়া কিছু সংগ্রহ করেন নি। তাঁর কোন ছেলে-পিলে, বন্ধু, ঘর সংসার বা অন্য কোন সহায় ছিল না। **১৮** বছর বয়স থেকেই, তাঁর মনোনিয়ন্ত্রন বড়ই বিলক্ষণ ছিল। তিনি নির্ভয়ে নির্জন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং সর্বদা আত্মমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল- **"আমি সর্বদা ভক্তের অধীন।"** তিনি যখন বেঁচে ছিলেন, সেই সময় ভক্তদের যে রকম অভিজ্ঞতা দিয়েছিলেন, মহাসমাধির পর আজও, তাঁর প্রতি অনুরক্ত ভক্তরা সে অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকেন। ভক্তদের শুধু নিজেদের হৃদয় প্রদীপটিতে ভক্তি-প্রেমের সল্‌তে জ্বালাতে হবে। জ্ঞান-জ্যোতি (আত্মসাক্ষাৎকার) নিজেই প্রকাশিত হয়ে উঠবে। **প্রেমের অভাবে শুষ্ক জ্ঞান বৃথা। এমন জ্ঞান কারো জন্যই লাভপ্রদ হয় না।** তাই আমাদের প্রেম অসীম এবং অটুট হওয়া উচিত। প্রেমের কীর্তির গুণগান কেই বা করতে পারে? তার তুলনায় সমস্ত বস্তু তুচ্ছ মনে হয়। প্রেমাঙ্কুর উদয় হতেই ভক্তি ও বৈরাগ্য, শান্তি এবং কল্যাণরূপী সম্পত্তি সহজেই প্রাপ্ত হয়। ঐকান্তিক ইচ্ছে না হলে, কোন ভাবেই প্রেম লাভ হওয়া সম্ভব নয়। তাই যেখানে **ব্যাকুল ভাব ও প্রেম আছে, সেখানে ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত**

হন। ভাবেই প্রেম অন্তর্নিহিত থাকে এবং সেটাই মোক্ষ প্রদান করে। চালাকি করেও, যদি কেউ কোন খাঁটি সন্তের কাছে গিয়ে তাঁর চরণ ধরে নেয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত উদ্ধার পায়। এমনি একটি ঘটনা নীচে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী শেওয়াডে ঃ-

আক্কালকোটের (সোলাপুর জিলা) শ্রী সপ্টণেকর তখন আইনের ছাত্র। একদিন ওঁর এক সহপাঠী শ্রী শেওয়াডের সাথে দেখা হয়। অন্যান্য বিদ্যার্থীরাও সেখানে ছিল এবং কার কতটা পড়াশুনা এগিয়ে গেছে সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। প্রশ্নোত্তরে বোঝা যায় যে সব চেয়ে কম অধ্যয়ন শ্রী শেওয়াডে করেছিলেন এবং পরীক্ষায় বসার মত প্রস্তুতিও তাঁর ছিল না। সবাই মিলে ওঁকে বিদ্রুপ করে। কিন্তু শেওয়াডে বলেন- "যদিও আমার অধ্যয়ন অপূর্ণ, তবুও আমি পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হব। আমার সাইবাবাই সবাইকে সফলতা দেন।" শ্রী সপ্টণেকর এই কথা শুনে উনি খুব অবাক হন এবং শ্রী শেওয়াডেকে জিজ্ঞাসা করেন- "এই সাইবাবা কে, যার তুমি এত প্রশংসা করছ?" শ্রী শেওয়াডে উত্তর দেন যে- "তিনি এক ফকির এবং শিরডীতে একটি মস্‌জিদে থাকেন। তিনি এক মহান পুরুষ। অনেক সাধু-সন্তই আছেন। কিন্তু তাঁর তুলনা নেই। যতক্ষন পূর্বজন্মের পূণ্য সঞ্চিত না হয়, ততক্ষন তাঁর দর্শন হওয়া দুর্লভ। আমি তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করি। তাঁর শ্রীমুখ থেকে যে কথা বেরোয়, সেটা কখনো মিথ্যে হয় না। তিনি আমায় আশ্বাস দিয়েছেন যে, আমি পরের বছর ঠিক পাশ করবো। আমারও এই বিশ্বাস যে, আমি তাঁর কৃপায় পরীক্ষায় নিশ্চয়ই

সফলতা পাব।" শ্রী সপ্টণেকরের বন্ধুর এরকম বিশ্বাস দেখে হাসি পায়। বন্ধুর সাথে-সাথে উনি শ্রী সাইবাবারও উপহাস করেন।

শ্রী সপ্টণেকর ঃ-

শ্রী সপ্টণেকর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, আক্কালকোটেই থাকতেন এবং সেখানেই ওকালতি শুরু করেন। দশবছর পর **১৯১৩** সালে, ওঁর একমাত্র পুত্রের গলার রোগে মৃত্যু হয়। তাই ওঁর মন প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে ওঠে। মানসিক শান্তির খোঁজে উনি পন্ঢরপুর, গঙ্গাপুর এবং অন্যান্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। কিন্তু ওঁর মনের অশান্তি দূর হয় না। উনি বেদান্তের পাঠও শ্রবণ করেন- তাতেও কোন লাভ হয় না। হঠাৎ ওঁর শ্রী শেওয়াডের শ্রী সাইবাবার প্রতি বিশ্বাসের কথা মনে পড়ে এবং উনি স্থির করেন যে- উনিও শিরডী গিয়ে শ্রী সাইবাবার দর্শন করবেন। ছোট ভাই পণ্ডিতরাওকে নিয়ে উনি শিরডী আসেন। বাবার দর্শন করে ওঁর খুবই আনন্দ হয়। বাবার কাছে গিয়ে প্রণাম করে শুদ্ধ মনে একটা শ্রীফল অর্পণ করতে যাবেন, এমন সময় বাবা রেগে উঠে বলেন- "বেরিয়ে যাও এখান থেকে।" শ্রী সপ্টণেকরের মাথা নত হয়ে যায় এবং উনি একটু সরে পেছনে গিয়ে বসেন। কি ভাবে বাবার কাছে যাওয়া সম্ভব- সে বিষয়ে কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইতেন। কেউ একজন ওঁকে বালাশিম্পীর কাছে যেতে বলে। শ্রী সপ্টণেকর তাঁর কাছে গিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। তখন ওঁরা দুজনে বাবার একটা ছবি কিনে মস্‌জিদে আসেন। বালাশিম্পী নিজের হাতের ছবিটা বাবাকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন- "এটা কার ছবি?" বাবা সপ্টণেকরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- "এটা তো আমার বন্ধুর।" এই বলে, তিনি হাসতে আরম্ভ করেন। বালাশিম্পী ইঙ্গিত করাতে, শ্রী সপ্টণেকর যেই বাবাকে প্রণাম করতে যান অমনি

বাবা আবার চেঁচিয়ে বলেন- "বাইরে যাও।" শ্রী সপ্টণেকর বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কি করলে ভালো হয়।। তখন ওঁরা দুজনে বাবার সামনে গিয়ে বসেন কিন্তু বাবা ওঁদের তক্ষুনি চলে যেতে আদেশ দেন। ওঁরা খুবই নিরাশ হন। তাঁর আদেশ কেই বা অবহেলা করতে পারত? অবশেষে শ্রী সপ্টণেকর খিন্ন হৃদয়ে শিরডী থেকে ফিরে যান। উনি মনে-মনে প্রার্থনা করেন- "হে সাই! আমি আপনার কাছে দয়ার ভিক্ষে চাইছি। এতটা ভরসা দিন যে, ভবিষ্যতে কখনো না কখনো আপনার শ্রী দর্শনের অনুমতি আমি অবশ্যই পাব।"

শ্রীমতি সপ্টণেকর ঃ-

এক বছর কেটে যায়, তাও ওঁর মন শান্ত হয় না। গঙ্গাপুর গিয়ে ওঁর মনের অশান্তি আরো বেড়ে যায়। তারপর উনি মাধেগাঁওতে বিশ্রাম করতে যান এবং সেখান থেকে কাশী যাবেন স্থির করেন। রওনা হওয়ার দুদিন আগে, ওঁর স্ত্রী স্বপ্ন দেখেন যে উনি একটা কলসী নিয়ে কুয়োতে জল ভরতে যাচ্ছেন। সেখানে নিম গাছের নীচে একজন ফকির বসে আছেন। ফকির ওঁর কাছে এসে বলেন- "মামণি, তুমি মিছিমিছি কেন কষ্ট করছ? দাও, আমি তোমার কলসীতে পরিষ্কার জল ভরে দিচ্ছি।" ফকিরের ভয়ে উনি খালি কলসী নিয়ে ফিরে আসেন। ফকিরও ওর পেছন-পেছন ধাওয়া করতেই, ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং চোখ খুলে উঠে বসেন। এই স্বপ্নের কথা উনি নিজের স্বামীকে জানান। এটা একটা শুভ লক্ষণ মনে করে, দুজনে শিরডী যাওয়া স্থির করেন। এবার যখন ওঁরা মস্‌জিদে গিয়ে পৌঁছান, তখন বাবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি লেন্ডী বাগানে গিয়েছিলেন। ওঁরা ওখানেই বাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যখন

বাবা ফিরে আসেন, তখন তাঁকে দেখে শ্রীমতি সপ্টণেকর খুবই অবাক হয়ে যান। স্বপ্নে দেখা ফকির, হুবহু বাবার মতই দেখতে ছিল। উনি বাবাকে প্রণাম করে, সেখানে বসে-বসেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁর বিনম্র স্বভাব দেখে, বাবা অত্যন্ত প্রসন্ন হন। নিজের পদ্ধতি অনুসারে, উনি এক তৃতীয় ব্যক্তিকে একটা গল্প শোনাতে শুরু করেন- "আমার হাতে, পেটে, কোমরে এবং সারা শরীরে অনেক দিন ধরে ব্যথা হচ্ছিল। আমি অনেক চিকিৎসা করাই, কিন্তু কোন লাভ হয় না। ওষুধ খেয়ে-খেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এখন আমার খুব আশ্চর্য্য লাগছে যে, আমার সব ব্যথা হঠাৎই চলে গেছে।" যদিও কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু এই গল্পটি শ্রীমতি সপ্টণেকরের নিজের। ওঁরই ব্যথা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং উনি, তাতে খুবই খুশী হন।

সন্ততি দান ঃ-

শ্রী সপ্টণেকর দর্শন করার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু বাবার ঐ একই অভ্যর্থনা- "বেরিয়ে যাও।" এবার উনি অনেক ধৈর্য্যশীল ও নম্র হয়ে এসেছিলেন। ওঁর মনে হয় যে, গত কর্মের জন্যই বাবা ওনার উপর অপ্রসন্ন হয়েছেন। উনি প্রায়শ্চিত্ত করবেন স্থির করেন। বাবার সাথে একান্তে দেখা করে, নিজের গত কর্মের জন্য ক্ষমা চাইবেন এবং করলেনও তাই। বাবার চরণে মাথা রাখলেন এবং তখন বাবা ওঁকে আশীর্বাদ করেন। শ্রী সপ্টণেকর বাবার পা টিপতে বসেছেন। এমন সময় একটি রাখাল মেয়ে এসে বাবার কোমর টিপতে আরম্ভ করে। তখন বাবা তাদের একটা বেনের গল্প বলতে শুরু করেন। যখন তিনি ওঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন এবং ওঁর একমাত্র ছেলের মৃত্যুর কথা বলেন তখন শ্রী সপ্টণেকরের খুব অবাক লাগে। উনি

অবাক হয়ে ভাবেন যে, বাবা ওঁর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার বিষয় কি করে জানেন? উনি সহজেই বুঝতে পারেন যে, বাবা অন্তর্যামী এবং প্রত্যেকের হৃদয়ের সব রহস্য তিনি জানেন। এই কথা ওর মনে আসতেই, বাবাও এদিকে মেয়েটির সাথে কথা বলতে-বলতে, সপ্টণেকরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- "এই ভদ্রলোকটি আমায় দোষ দিচ্ছেন যে আমি এর ছেলেকে মেরে ফেলেছি। আমি কি লোকদের সন্তানদের প্রাণ নিই? তাহলে উনি মস্‌জিদে এসে কান্নাকাটি করছেন কেন? এবার আমি একটা কাজ করব। সেই ছেলেটিকে আবার ওঁর স্ত্রীর গর্ভে এনে দেব।" এই বলে বাবা নিজের অভয়হস্ত সপ্টণেকরের মাথায় রাখেন এবং ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- **"এই চরণ অতি পুরাতন ও পবিত্র। চিন্তামুক্ত হয়ে আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখলে তোমার অভীষ্ট শীঘ্রই পূর্ণ হবে।** শ্রী সপ্টণেকরের হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে। চোখের জলে বাবার চরণ ধুয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসেন। পূজোর সামগ্রী ঠিক করে, নৈবেদ্য ইত্যাদি নিয়ে উনি সপত্নীক মস্‌জিদে যান। এই ভাবে উনি নিত্য নৈবেদ্য অর্পণ করতেন এবং বাবার কাছ থেকে প্রসাদও পেতেন। মস্‌জিদে অসম্ভব ভীড় থাকা সত্ত্বেও, উনি সেখানে গিয়ে বার-বার বাবাকে প্রণাম করতেন। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লাগতে দেখে, বাবা বলেন- **"প্রেম ও বিনয়ের সঙ্গে করা একটা নমস্কারই যথেষ্ট।"** সেই রাত্রেই ওঁর চাত্তড়ী উৎসব দেখার সৌভাগ্য হয় এবং বাবা ওঁকে পান্ডুরঙ্গ রূপে দর্শন দেন। পরের দিন রওনা হওয়ার জন্য ব্যবস্থা করার সময় ওঁর মনে হয়- "প্রথমে বাবাকে একটা টাকা দক্ষিণা দেব। যদি তিনি আরেক টাকা চান তাহলে মানা না করে, আরেক টাকাও অর্পণ করব। তাও

যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট টাকা বাঁচবে।" মস্‌জিদে গিয়ে বাবাকে এক টাকা দক্ষিণা দিতেই, ওঁর মনের ইচ্ছে জেনে, বাবা আরো এক টাকা চান। শ্রী সপ্টণেকর সেটা সহর্ষে দিতেই, বাবা ওঁকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেন- "এই নারকেলটি নিয়ে যাও এবং তোমার বৌয়ের কোলে রেখো। নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যাও।" শ্রী সপ্টণেকর তাই করেন। এক বছর পর, ওঁর একটি পুত্রসন্তান হয়। আট মাসের শিশুকে নিয়ে, ঐ দম্পতি আবার শিরডী আসেন এবং বাবার চরণে শিশুটিকে রেখে এইরূপ প্রার্থণা করেন- "হে শ্রী সাইনাথ! আপনার ঋণ আমরা কিভাবে শোধ করতে পারব, জানি না। আপনার শ্রীচরণে আমরা বারম্বার প্রণাম জানাই। আমরা অসহায় ও অনাশ্রিত। আশীর্বাদ করুন প্রভু, যেন আপনার চরণকমলই আমাদের আশ্রয় হয়। উঠতে-বসতে, শুতে-জাগতে নানা রকম চিন্তা-ভাবনায় আমাদের মন অস্থির হয়ে ওঠে। আশীর্বাদ দিন যেন আপনার ভজনেই আমাদের মন মগ্ন হয়ে থাকে।"

ঐ ছেলেটির নাম 'মুরলীধর' রাখা হয়। পরে তাঁদের আরো দুটি পুত্র (ভাস্কর ও দিনকর) হয়েছিল। সপ্টণেকর দম্পতি এই ভাবে উপলব্ধি করেন যে, বাবার কথা কখনো অসত্য হয় না, অপরিপূর্ণ থাকে না।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪৯

পরীক্ষা ঃ ১) হরি কনোবা, ২) সোমদেব স্বামী, ৩) নানা সাহেব চাঁদোরকরের কাহিনী

প্রস্তাবনা ঃ-

বেদ ও পুরাণও যেখানে ব্রহ্ম বা সদ্‌গুরুর বর্ণনা করতে নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করে, সেখানে আমি এক অল্পজ্ঞ প্রাণী সদ্‌গুরু শ্রী সাইবাবার বর্ণনা কি করে করতে পারি? আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, এই বিষয়ে মৌন ধারণ করাই উচিত। মূক থাকাই সদ্‌গুরুর গুণকীর্তন করার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু তাঁর অসাধারণ গুণগুলি আমাদের মূক থাকতে দেয় কোথায়? নানা রকমের সুস্বাদু খাবার যদি বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন একসাথে বসে না খায়, তাহলে সে সব তেমন মুখরোচক হয় না। সেই খাবারই সবার সাথে বসে খেলে, তাতে একটা বিশেষ স্বাদ পাওয়া যায়। এই সত্যটি 'সাই লীলামৃত'-এর বিষয়েও প্রযোজ্য। এর রসাস্বাদন একান্তে কখনোই হতে পারে না। যদি বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের লোকেরা সবাই মিলে এর রস গ্রহন করে, তাহলে আনন্দ আরো বেশী হয়। শ্রী সাইবাবা নিজেই অন্তঃপ্রেরণা দিয়ে তাঁর ইচ্ছানুসারেই তাঁর কথা আমাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন। তাই আমাদের শুধু এতটাই কর্তব্য যে, অনন্য ভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁরই ধ্যান করি। **তপ-সাধন, তীর্থযাত্রা, ব্রত এবং যজ্ঞ ও দানের চেয়ে হরি-ভক্তি শ্রেষ্ঠ এবং সদ্‌গুরুর ধ্যান এদের সবার মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ। তাই সর্বদা মুখ দিয়ে সাইনাম স্মরণ করে উপদেশগুলির**

নিদিধ্যাসন এবং তাঁর স্বরূপ চিন্তন করে সমস্ত কর্ম তাঁর জন্যই করা উচিত। ভববন্ধন থেকে মুক্তির এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছু নেই। **এভাবে যদি আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করি, তাহলে সাইকে বাধ্য হয়ে আমাদের সাহায্য করে, মুক্তি প্রদান করতেই হবে।** এবার এই অধ্যায়ের ঘটনাগুলি শুনুন।

হরি কনোবা ঃ-

বম্বের শ্রী হরি কনোবা নামে এক ভদ্রলোক নিজের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে শ্রী সাইবাবার অনেক লীলা শুনেছিলেন। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস হত না। উনি এক সন্দিগ্ধ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। উনি স্বয়ং বাবাকে পরীক্ষা করবেন স্থির করে, কয়েকজন বন্ধুর সাথে বম্বে থেকে শিরডী আসেন। ওঁর মাথায় ছিল একটা জরির পাগড়ী ও পায়ে নতুন চটি। দূর থেকে বাবাকে দেখে, কাছে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করতে চাইছিলেন। কিন্তু ওঁর নতুন চটি এই কাজে বাধ সাধল। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষে চটির জোড়াটি মন্ডপের এক কোণে রেখে মস্‌জিদে গিয়ে বাবার দর্শন করেন। কিন্তু মনটা চটিতেই পড়েছিল। শ্রদ্ধাপূর্বক বাবাকে প্রণাম করে প্রসাদ এবং উদী নিয়ে, উনি ফিরে আসেন। এসে দেখেন যে, চটি উধাও। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলেন না। শেষে মনঃক্ষুন্ন হয়ে উনি ঘরে ফিরে গেলেন।

স্নান, পূজো ও নৈবেদ্য অর্পণ করে, খেতে বসলেন। কিন্তু সমস্তটা সময় চটির চিন্তাই মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। খাবার খেয়ে মুখ হাত ধুয়ে, উনি বাইরে বেরিয়ে দেখেন, একটা মারাঠা ছেলে

ওঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। ওর হাতে একটা লাঠির আগায় এক জোড়া চটি ঝুলছিল। বাইরে যারা হাত ধুতে আসছিল তাদের ঐ ছেলেটি বলে- "বাবা আমায় এই লাঠিটা হাতে দিয়ে, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে 'হরির বেটা, জরির ফেটা'- বলে ডাক দিতে বলেছেন। তিনি এও বলেছেন- যে বলবে এই চটি তার, তাকে আগে জিজ্ঞাসা করবে যে, তার নাম কি হরি এবং ওর পিতার নাম কি 'ক' দিয়ে (অর্থাৎ কনোবা) কি না। তার সাথে-সাথে এও দেখো যে, ওর মাথায় জরির ফেটা (পাগড়ী) আছে কি না। তবেই তাকে চটিটা দিও।" ছেলেটির কথা শুনে হরি কনোবার খুব আনন্দ হয় ও আশ্চর্য্যও লাগে। উনি এগিয়ে গিয়ে বলেন- "এটা আমার চটি। আমারই নাম হরি এবং আমিই 'ক'র (কনোবা) ছেলে। এই আমার জরির পাগড়ী দেখো।" ছেলেটি সন্তুষ্ট হয়ে চটি ওঁকে দিয়ে চলে যায়। উনি ভাবেন- "আমার জরির পাগড়ী তো সবাই দেখেছে। হতে পারে বাবার দৃষ্টিও পড়েছিল। কিন্তু আমি প্রথম বার শিরডী এসেছি, তবে বাবা কি করে জানতে পারলেন যে, আমারই নাম হরি ও আমার পিতার কনোবা?" উনি তো কেবল বাবাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। এই ঘটনার দ্বারা বাবার শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পান। ওঁর ইচ্ছে পূরণ হয় এবং উনি সহর্ষে বাড়ী ফিরে আসেন।

সোমদেব স্বামী ঃ-

এবার আরেক অবিশ্বাসী ব্যক্তির কথা শুনুন। তিনিও বাবাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছিলেন। কাকাসাহেব দীক্ষিতের ভাই শ্রী ভাইজী নাগপুরে থাকতেন। **১৯০৬** সালে যখন উনি হিমালয়ে যান তখন হরিদ্বারের কাছে উত্তরকাশীতে, ওঁর সোমদেব স্বামীর (এক সাধু) সঙ্গে পরিচয় হয়। একজন আরেকজনের ঠিকানা লিখে নেন।

পাঁচ বছর পর সোমদেব স্বামী নাগপুর আসেন এবং ভাইজীর বাড়ীতে এসে ওঠেন। সেখানে শ্রী সাইবাবার খ্যাতি শুনে, ওঁর খুব আনন্দ হয় এবং শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করার তীব্র আকাঙ্খা জাগে। মনমাড ও কোপরগ্রাম পেরিয়ে গেলে, উনি একটা টাঙ্গায় চড়ে শিরডী রওনা হন। শিরডী পৌঁছে, দূর থেকেই মস্‌জিদের ওপরে দুটি পতাকা উড়তে দেখেন। সাধারণত- দেখা যায় যে, বিভিন্ন সন্তদের ব্যবহার, চালচলন এবং তাঁদের জীবনযাত্রা আলাদাই হয়। কিন্তু শুধু তা দিয়েই, তাঁদের যোগ্যতা ধার্য্য করাটা ভুল। সোমদেব স্বামী কিন্তু সে কথা বুঝতে পারেন না। পতাকাগুলি উড়তে দেখে উনি ভাবেন- "সন্ত হয়ে বাবার এই পতাকার প্রতি এত অনুরাগ কেন? এতে কি তার সন্তচরিত্র প্রকাশ পায়? আমার তো মনে হয়, বাবার নিজের খ্যাতির প্রতি খুব টান।" অতএব উনি শিরডীতে বাবার দর্শন করার ইচ্ছে ত্যাগ করে সহযাত্রীদের বলেন- "আমি ফিরে যেতে চাই।" তখন ওরা বলে- "তাহলে এত দূর মিছিমিছি এলে কেন? শুধু দুটো পতাকা দেখেই, তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছ। যখন রথ, পাল্কি, ঘোড়া এবং অন্যান্য সামগ্রী দেখবে, তখন তোমার কি অবস্থা হবে?" স্বামী এতে আরো ঘাবড়ে যান এবং বলেন- "আমি অনেক সাধু-সন্তের দর্শন করেছি। কিন্তু এই মহাপুরুষ তো অদ্ভুত, যিনি এইসব ঐশ্বর্য্যের সামগ্রী সংগ্রহ করেন। এই ধরনের সাধুর দর্শন না করাই ভালো।" এই বলে, উনি ফিরে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু অন্যান্য সহযাত্রীরা ওঁকে প্রতিরোধ করে, এরকম সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ছাড়তে বলে। তারা জানায়- "মস্‌জিদে যে সাধু থাকেন, তিনি এই পতাকা বা অন্য সামগ্রী বা নিজের খ্যাতির কথা স্বপ্নেও ভাবেন না। এ সব তাঁর ভক্তরা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালোবাসায় তাঁকে অর্পণ করেছে।" শেষে উনি বাবার দর্শন করতে রাজী হন। মস্‌জিদের মন্ডপে পৌঁছে উনি স্তব্ধ হয়ে যান।

ওঁর চোখ জলে ভরে আসে ও কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। এবার ওঁর সব দূষিত ধারণা মন থেকে দূর হয়ে, নিজের গুরুর উপদেশ মনে পড়ে- "মন যেখানে অতি প্রসন্ন ও মুগ্ধ হয়, সেই স্থানটিকেই নিজের বিশ্রামধাম মনে কোর।" উনি বাবার চরণে লুটিয়ে পড়তে চাইছিলেন কিন্তু বাবার কাছে যেতেই, বাবা সহসা রেগে ওঠেন এবং চেঁচিয়ে বলেন- "আমার জিনিষ-পত্তর আমার কাছেই থাকতে দাও। তুমি নিজের বাড়ী ফিরে যাও। সাবধান! আর কখনো এই মস্‌জিদের সিঁড়ি চড়ো না। এমন সন্তের দর্শন করার কি দরকার, যে মস্‌জিদের উপর পতাকা ওড়ায়। এটা কি সন্ত হওয়ার লক্ষণ? এক দন্ডও এখানে থেকো না।" এবার সোমদেব স্বামী বুঝতে পারেন যে বাবা ওঁর মনের সমস্ত কথা জানেন এবং তিনি কত সর্বজ্ঞ। নিজের জ্ঞানের কথা ভেবে, ওঁর হাসি পায় এবং উনি অনুভব করেন যে, বাবা কত নির্বিকার ও পবিত্র। উনি দেখেন যে বাবা কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন, কাউকে স্পর্শ করছেন, আবার কাউকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। সব ভক্তদেরই 'উদী' প্রসাদ দিয়ে, সব রকম ভাবে আনন্দ দিচ্ছেন। এই সব দেখে ওঁর মনে হয়- "আমার সাথেই এমন রুক্ষ ব্যবহার কেন?" গভীর ভাবে চিন্তা করার পর বুঝতে পারেন- "এর আসল কারণ আমার অন্তরের বিচারধারা। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, আমায় নিজেকে বদলানো উচিত। বাবার রাগও আমার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।" বলাবাহুল্য, উনি তারপর বাবার শরণে গিয়ে, তাঁর পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন।

নানা সাহেব চাঁদোরকর ঃ-

এবার নানাসাহেব চাঁদোরকরের কথা লিখে হেমাডপন্ত এই অধ্যায়টি শেষ করছেন। একবার বাবা নানাসাহেব মহালসাপতি এবং

অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে মস্‌জিদে বসেছিলেন। সেই সময় বিজাপুর থেকে এক মুসলমান ভদ্রলোক সপরিবারে শ্রী সাইবাবার দর্শন করতে আসেন। বোরখা পরা মহিলাদের লাজুক ভাব দেখে, নানাসাহেব সেখান থেকে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু বাবা ওঁকে সেখানেই বসে থাকতে বলেন। মহিলা দুটি এগিয়ে গিয়ে বাবাকে দর্শন করেন। ওঁদের মধ্যে একজন নিজের মাথার ঘোমটাটি সরিয়ে, বাবার চরণে প্রণাম করে, আবার ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে নেন। নানাসাহেব মহিলাটির অপরূপ ও বিরল সৌন্দর্য্যর প্রতি আকর্ষিত হয়ে, আরেক বার সেই রূপ দেখার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। মহিলাটি চলে যাওয়ার পর, নানার মনের অবস্থা জেনে, বাবা ওঁকে বলেন- "নানা, **মিছিমিছি কেন মোহিত হচ্ছ? ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজেদের কাজ করতে দাও। আমাদের তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। ভগবান এই সুন্দর জগত নির্মাণ করেছেন। অতএব আমাদের কর্তব্য তার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করা।** এই মন তো ধীরে-ধীরেই স্থির হয় এবং যখন সামনের দরজা খোলা আছে, তখন পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার কি দরকার? চিত্ত শুদ্ধ হতেই, কোন কষ্ট অনুভব হয় না। যদি আমাদের মনে কোন কুবিচার না থাকে, তাহলে কারো কাছে ভয় পাওয়ার কি দরকার? চোখ দুটিকে নিজের কাজ করতে দাও। তার জন্য তোমার লজ্জিত বা বিচলিত হওয়া উচিত নয়।" সে সময় শামাও সেখানেই ছিলেন। উনি বাবার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারেন না। তাই মস্‌জিদ থেকে ফেরার পথে নানাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঐ পরম সুন্দরীর সৌন্দর্য্য দেখে উনি যেরকম মোহিত হয়েছিলেন এবং সেই মনঃকষ্ট জেনে বাবা ওঁকে যা উপদেশ দেন তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত নানাসাহেব শামাকে এইরূপ বোঝান -

"আমাদের মন স্বভাবতই চঞ্চল, কিন্তু আমাদের তাকে লম্পট হতে দেওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রিয়গুলি তো সব সময় নিজেদের বিষয় পদার্থের প্রতি ধাওয়া করে। কিন্তু তাদের পেছনে আমরা যেন ধাওয়া না করি। এই ভাবে অভ্যাস করলে, চঞ্চলতা জয় করা যেতে পারে। **যদিও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ (ইন্দ্রিয়গুলি দমন করা) সম্ভব নয় তবুও তাদের বশীভূত হওয়া উচিত নয়।** প্রয়োজান অনুসারে আমাদের ঠিক ঠিক ভাবে সেগুলির গতি অবরোধ করা উচিত। সৌন্দর্য্য তো দেখার জিনিষ, তাই নির্ভয়ে সুন্দর জিনিষগুলি দেখা উচিত। যদি মনে কোন কুবিচার না থাকে তাহলে লজ্জা বা ভয়ের প্রয়োজনই বা কি? **ইচ্ছাশূন্য মন নিয়ে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও, ইন্দ্রিয়গুলি সহজ ও স্বাভাবিক রূপে আমাদের বশে এসে যাবে। তখন বিষয়ানন্দ উপভোগ করার সময়ও, তোমার ঈশ্বরের কথাই মনে পড়বে।** যদি মনকে বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির পেছনে ছেড়ে ও সেগুলিতে লিপ্ত থাকতে দাও, তাহলে জন্ম-মৃত্যুর পাশ থেকে কখনো মুক্তি পাবে না। বিষয় পদার্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে সব সময় পথভ্রষ্ট করে। অতএব আমাদের উচিত বিবেককে সারথি করে, মনের লাগাম নিজের হাতে নিয়ে, ইন্দ্রিয়রূপী ঘোড়াকে কাম্য বস্তুর দিকে না যেতে দেওয়া। এই ভাবে বিবেকরূপী সারথির সাহায্যে, আমরা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত করতে পারব। সেটি হল আমাদের আসল পরম সত্যধাম, এবং সেখানে গিয়ে প্রাণী আর কখনো এখানে ফিরে আসে না।"

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৫০

১) কাকাসাহেব দীক্ষিত ২) শ্রী টেম্বে স্বামী ৩) বালারাম ধুরন্ধরের কাহিনী।

মূল মারাঠি 'সৎচরিত্র' গ্রন্থের **৫০** তম অধ্যায়টির একই বিষয় বলে এই গ্রন্থে **৩৯** তম অধ্যায়ের সঙ্গে এক সাথে জোড়া হয়েছে। তাই মূল গ্রন্থের **৫১** অধ্যায়টি এই গ্রন্থে **৫০** তম অধ্যায়ের রূপে দেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

সাই মহারাজের জয় হোক, যিনি ভক্তদের অবলম্বন ও সর্বশক্তি দাতা। তিনি গীতাধর্মের উপদেশ দিয়ে আমাদের শক্তি প্রদান করছেন। হে সাই, কৃপাদৃষ্টিসহ আমাদের আশিস দাও। যেমন মলয় পর্বতের চন্দন বৃক্ষ সব তাপ হরণ করে, নেয় অথবা যেভাবে মেঘ জলবৃষ্টি করে লোকেদের শীতলতা ও আনন্দ প্রদান করে, বা যেমন বসন্তে ফোটা ফুল ঈশ্বরের পূজোর কাজে লাগে, সেই রকমই শ্রী সাইবাবার লীলা কাহিনীগুলি পাঠক ও শ্রোতাদের ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা প্রদান করে। যারা এই লীলাগান করে বা শোনে তারা দুজনেই ধন্য। কারণ, বলায় মুখ ও শোনায় কান পবিত্র হয়ে যায়।

এটা তো সবাই স্বীকার করবে যে, শত রকমের সাধনা করা সত্ত্বেও সদগুরুর কৃপা না হলে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনুন -

কাকাসাহেব দীক্ষিত (১৮৬৪-১৯২৬) ঃ-

শ্রী হরি সীতারাম ওরফে কাকাসাহেব দীক্ষিত **১৮৬৪** সালে খাণ্ডোয়াতে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ওঁর প্রাথমিক শিক্ষা খাণ্ডোয়া ও হিঙ্গন ঘাটে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা নাগপুরে হয়। তারপর বম্বেতে, উনি প্রথমে উইল্‌সন ও পরে এল্‌ফিন্সটন কলেজে অধ্যয়ন করেন। **১৮৮৩** সালে স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে L.L.B ও Solicitor য়ের পরীক্ষা পাশ করে সরকারী Solicitor ফার্ম-মেসার্স লিটিল এ্যাণ্ড কোম্পানীতে কাজ করতে শুরু করেন। কিছুদিন পর উনি নিজের একটা সলিসিটর ফার্ম খোলেন।

১৯০৯ সালের আগে বাবার কথা উনি কখনো শোনেননি। কিন্তু এরপর উনি খুব শীঘ্রই বাবার পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। লোনাওয়ালায় থাকাকালীন ওঁর এক পুরোন বন্ধু শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের সাথে হঠাৎ দেখা হয়। দুজনে এদিক-ওদিকের আলোচনায় সময় কাটাতেন। কাকাসাহেব ওঁকে জানান যে, যখন উনি লন্ডনে ছিলেন সেই সময় একবার ট্রেনে চড়তে গিয়ে উনি পা ফস্‌কে পড়ে যান। তাতে পায়ে খুব আঘাত পান। ঘটনাটি শুনে নানাসাহেব ওঁকে বলেন- "যদি তুমি এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চাও, তাহলে আমার সদ্‌গুরু শ্রী সাইবাবার শরণে যাও।" উনি বাবার পুরো ঠিকানা দিয়ে, তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেন- **"আমি নিজের ভক্তকে সাত সমুদ্র পার থেকেও এমন ভাবে টেনে আনব যেমন সূতোয় বাঁধা পাখীকে টেনে নিজের কাছে আনা হয়।"** উনি এও স্পষ্ট করে দেন- "তুমি যদি বাবার আপনজন না হও, তাহলে তোমার তাঁর প্রতি আকর্ষণই জাগবে না এবং তাঁর দর্শনও পাবে না।"

কাকাসাহেব এই কথা শুনে খুব খুশী হন এবং বলেন যে, শিরডী গিয়ে বাবার কাছে শারীরিক পঙ্গুতার বদলে, ওঁর চঞ্চল মনকে পঙ্গু করে পরমানন্দের প্রাপ্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থণা করবেন। কিছুদিন পরই বম্বে বিধান সভার (Legislative Assembly) নির্বাচনে ভোট সংক্রান্ত ব্যাপারে কাকাসাহেব দীক্ষিত আহমদনগর যান এবং প্রত্যেকবারের ন্যায় মিরীকরের বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। শ্রী বালাসাহেব মিরীকর- কোপরগ্রামের মাম্‌লৎদার কাকাসাহেব মিরীকরের সুপুত্র- সেই সময় অশ্ব প্রদর্শনী দেখার জন্য আহমদনগর এসেছিলেন। এদিকে পিতা-পুত্র দুজনেই চিন্তা করছিলেন যে, কাকাসাহেবের সঙ্গে কাকে শিরডী পাঠানো যেতে পারে আর ওদিকে বাবা অন্য আর এক ভাবে ওঁকে নিজের কাছে আনার ব্যবস্থা করছিলেন। শামার কাছে টেলিগ্রাম আসে যে, ওঁর শাশুড়ীর অবস্থা খুব শোচনীয় এবং উনি যেন অবিলম্বে আহমদনগর আসেন। বাবার কাছে অনুমতি নিয়ে, শামা ওখানে গিয়ে নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রদর্শনীতে যাওয়ার সময়, নানাসাহেব পানসে ও আপ্পাসাহেব গার্দের দৃষ্টি হঠাৎ শামার উপর পড়ে। ওঁরা শামাকে মিরীকরের বাড়ী গিয়ে কাকাসাহেব দীক্ষিতের সাথে দেখা করতে এবং ওঁকে নিজের সঙ্গে শিরডী নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। শামার আগমনের খবর দীক্ষিত ও মিরীকরকেও দিয়ে দেন। মিরীকর শামার সাথে কাকাসাহেবের পরিচয় করিয়ে দেন এবং এরপর এই স্থির হয় যে, কাকাসাহেব দীক্ষিত ও শামা রাত দশটার গাড়ীতে কোপরগ্রাম রওনা হবেন। এই ব্যবস্থার ঠিক পরেই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। বালাসাহেব মিরীকর বাবার একটা বড় ছবির উপর থেকে কাপড় সরিয়ে, কাকাসাহেবকে তাঁর দর্শন করান। এই দেখে কাকাসাহেব খুব আশ্চর্য্য হন এবং ভাবেন- "যাঁর দর্শনের জন্য আমি শিরডী যাচ্ছি, তিনি এই ছবির রূপে, আমাকে

অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এখানেই বিরাজমান।" স্তব্ধ হয়ে উনি বাবার বন্দনা করেন। এই ছবিটি ছিল মেঘার এবং কাঁচ লাগানোর জন্য মিরীকরের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কাঁচ লাগিয়ে সেটি কাকাসাহেব দীক্ষিত ও শামার হাতে শিরডী পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। দশটার আগেই স্টেশনে পৌঁছে, ওঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেনেন। গাড়ী স্টেশনে এসে পৌঁছলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিল ধারণের স্থান নেই- এত ভীড়। সৌভাগ্যক্রমে গার্ড সাহেব কাকাসাহেবকে চিনতেন এবং উনি এই দুজনকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিয়ে দেন। এই ভাবে আরামে যাত্রা করে, ওঁরা কোপরগ্রাম স্টেশনে নামেন। স্টেশনেই, শিরডীর জন্য রওনা হতে প্রস্তুত শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরকে দেখে, ওঁরা অত্যন্ত খুশী হন। শিরডী পৌঁছে মস্‌জিদে গিয়ে ওঁরা বাবার দর্শন করেন। তখন বাবা বলেন- "আমি অনেকদিন থেকেই তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম। আমিই শামাকে তোমায় আনতে পাঠাই।" এরপর কাকাসাহেব অনেক বছর বাবার সঙ্গে কাটান। উনি শিরডীতে একটা 'ওয়াড়া' (দীক্ষিত ওয়াড়া) তৈরী করান, যেটি প্রায় ওঁর স্থায়ী বাসস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনি বাবার কাছে যা অনুভূতি পান, সেগুলি এখানে স্থানাভাবে দেওয়া হচ্ছে না। পাঠকদের অনুরোধ করছি যে, আপনারা শ্রী সাই লীলা পত্রিকার বিশেষাংক (কাকাসাহেব দীক্ষিত) ভাগ ১২ -র ৬-৭ অঙ্ক নিশ্চয়ই পড়বেন। শুধু একটি তথ্য লিখে আমরা এই অধ্যায় সমাপ্ত করব। **বাবা ওঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শেষ সময় বাবা ওঁকে বিমানে নিয়ে যাবেন।** ঐ প্রতিশ্রুতির অর্থ বোঝা গেল- ৫ই জুলাই (১৯২৬ সাল) কাকাসাহেব হেমাডপন্তের সঙ্গে ট্রেনে যাত্রা করছিলেন। উনি বাবার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। **হঠাৎ ওঁর ঘাড়টা হেমাডপন্তের কাঁধের ওপর**

ঢলে পড়ে। কোনরকম কষ্ট বা যন্ত্রণা ভোগ না করেই, উনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

শ্রী টেম্বে স্বামী ঃ-

সন্তরা পরস্পরকে কি ভাবে ভাই-য়ের মত প্রেম করেন, এই কথাটাই এই দ্বিতীয় কাহিনীটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে। একবার শ্রী বাসুদেবানন্দ সরস্বতী, যিনি শ্রীটেম্বে স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন, গোদাবরীর তীরে রাজমহেন্দ্রীতে এসে শিবির গাড়লেন। তিনি ভগবান দত্তাত্রেয়ের কর্মকাণ্ডী, জ্ঞানী ও যোগী ভক্ত ছিলেন। নাঁদেড়ের (নিজাম স্টেট) এক উকিল নিজের বন্ধুদের সাথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং কথাবার্তার মাঝে শ্রী সাইবাবার কথা ওঠে। বাবার নাম শুনে, স্বামীজী তাঁকে করবদ্ধ প্রণাম করেন এবং পুন্ডলীক রাওকে (উকিল) একটা শ্রীফল দিয়ে বলেন- "তুমি গিয়ে আমার ভাই শ্রীসাইকে প্রণাম করে বোল, তিনি আমায় যেন না ভোলেন এবং সর্বদা আমার উপর যেন কৃপাদৃষ্টি রাখেন।" তিনি এও বলেন যে, সাধারণতঃ একজন সাধু অন্যজনকে প্রণাম করেন না- কিন্তু এখানে বিশেষভাবে এরকম করা হল। শ্রী পুন্ডলীক রাও শ্রীফলটি নিয়ে বলেন- "আমি এটি বাবাকে অবশ্যই দেব ও আপনার বার্তা পৌঁছে দেব।"

এক মাস পরই, পুন্ডলীক রাও অন্য বন্ধুদের সাথে শ্রীফল নিয়ে শিরডী রওনা হন। মনমাড পৌঁছে, জল খেতে যান। খালি পেটে জল খাওয়া উচিত নয় ভেবে, একটু চিড়ে মুখে দেন। কিন্তু সেটা বিস্বাদ লাগায়, একজন একটি নারকেল ভেঙ্গে সেটা চিড়েতে মিশিয়ে

দেয়। এই ভাবে চিড়েগুলি সুস্বাদু করে সবাই মিলে খায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে দেখা গেল যে, পুণ্ডলীক রাওকে শ্রীটেম্বে স্বামী যে নারকেলটি বাবাকে দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন সেটিই ভেঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। শিরডী পৌঁছে ওঁরা ভয়ে-ভয়ে, বাবার দর্শন করতে যান। এদিকে বাবা তো স্বামীজীর কাছ থেকে নারকেলের বিষয়ে বার্তা পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি প্রথমেই পুন্ডলীক রাওকে বলেন- "আমার ভাইয়ের পাঠানো বস্তুটি আনো।" উনি বাবার পা ধরে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন ও নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চান। তার পরিবর্তে উনি অন্য নারকেল দিতে চাইলেন, কিন্তু বাবা আপত্তি জানালেন এই বলে- "ঐ নারকেলটির মূল্য সাধারণ নারকেলের চেয়ে অনেক বেশী এবং তার ক্ষতিপূরণ আরেকটা নারকেল দিয়ে হতে পারে না। তবে আর চিন্তা করার কিছু নেই। আমারই ইচ্ছায় তোমায় ঐ নারকেলটি দেওয়া হয় এবং পরে আমার ইচ্ছাতেই পথে সেটি ভাঙ্গা হয়। **তুমি নিজের ঘাড়ে কর্তাভাব ("আমি করছি"- এই ভাব) আনছ কেন?[১] যে কোন বড় (ভালো) বা ছোট (মন্দ) কাজ করার সময় নিজেকে কর্তা না মনে করে, অভিমান ও অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে কাজটি করলে তোমার দ্রুত উন্নতি হবে।"[২]** কত সুন্দর ছিল তাঁর এই আধ্যাত্মিক উপদেশ।

শ্রী বালারাম ধুরন্ধর (১৮৭৮-১৯১০) ঃ-

সান্তাক্রুজ, বম্বের শ্রী বালারাম ধুরন্ধর 'পাথারে প্রভু' সম্প্রদায়ের এক সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। উনি বম্বের উচ্চ ন্যায়ালয়ে অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন এবং কোন এক সময় Government Law School য়ের

(Bombay) প্রধানাচার্য্যও ছিলেন। পরিবারে সবাই সাত্বিক ও ধার্মিক প্রবৃত্তির ছিলেন। উনি একটি বইও লিখেছিলেন। এরপর ওঁর মন আধ্যাত্মিক ও ধার্মিক বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয়। মন দিয়ে গীতা, তার টীকা জ্ঞানেশ্বরী এবং অন্য দার্শনিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। উনি পন্ঢরপুরের ভগবান বিঠোবার পরম ভক্ত ছিলেন। **১৯১২** সালে উনি শ্রী সাইবাবার দর্শনের সুযোগ পান। ছ' মাস আগে ওঁর ভাই বাবুলজী ও বামনরাও শিরডী এসে বাবার দর্শন করেছিলেন এবং বাড়ী ফিরে নিজেদের মধুর অনুভূতি শ্রী বালারাম ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শুনিয়েছিলেন। তখন সবাই মিলে শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করা স্থির করেন। এইদিকে শিরডীতে ওঁদের পৌঁছবার আগেই বাবা সবার সামনেই বলেন- "আজ আমার দরবারের কয়েকটি লোক আসছে।" পরে বাবার এই সুস্পষ্ট উক্তির কথা অন্যদের কাছে শুনে ধুরন্ধর পরিবার মহান আশ্চর্যান্বিত হন- ওঁরা নিজেদের শিরডী যাত্রার খবর কাউকেই দেননি। সবাই এসে বাবাকে প্রণাম করে, কথাবার্তা শুরু করেন। বাবা উপস্থিত লোকদের বলেন- "এরাই আমার দরবারের সেই লোক, যাদের বিষয় তোমাদের আগে বলেছিলাম।" তারপর ধুরন্ধর ভাইদের লক্ষ্য করে বলেন- "আমার সাথে তোমাদের পরিচয় ৬০ জন্ম পুরোন।" ওঁদের সবার স্বভাব ভদ্র ও নম্র ছিল। তাই ওঁরা হাত জোড় করে বসে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাবাকেই দেখছিলেন। ওঁদের মধ্যে সব প্রকারের সাত্বিক ভাব যেমন অশ্রুপাত্, রোমাঞ্চ, কন্ঠরুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি দেখা দেয়। সবাই খুবই আনন্দিত হন। এরপর ওঁরা খাবার খেতে যান। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর আবার মস্‌জিদে এসে বাবার পা টিপতে শুরু করেন। এই সময় বাবা ছিলিম (কলকে) পান করছিলেন। তিনি বালাসাহেবকে ছিলিমটি দিয়ে, একটা টান দিতে বলেন। যদিও আজ পর্যন্ত উনি কখনো ধূমপান করেননি, তবুও

ছিলিম হাতে নিয়ে অনেক কষ্টে বালারাম একটা টান দেন। তারপর সশ্রদ্ধ ভাবে সেটি বাবাকে ফিরিয়ে দেন। উনি ছ' বছর থেকে হাঁপানিতে ভুগছিলেন। কিন্তু ছিলিমে টান দিতেই, রোগমুক্ত হয়ে যান। ছ' বছর পর আরেকবার একটি বিশেষ দিনে, সেই কষ্ট দেখা দেয়। সেটি ছিল, বাবার মহাসমাধির দিন। বালারাম বৃহস্পতিবারে শিরডী এসেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে 'চাওড়ী' উৎসব দেখার সুযোগ পান। 'চাওড়ী'তে আরতির সময় বালারামের বাবার মুখ-মন্ডল ভগবান পাণ্ডুরঙ্গের মত মনে হয়। পরের দিন ভোর বেলা কাকড় আরতির সময় বালারাম নিজের পরম ইষ্টদেব পান্ডুরঙ্গের জ্যোতি বাবার মুখে আবার দেখতে পান।

শ্রীবালারাম ধুরন্ধর মারাঠীতে মহারাষ্ট্রের মহান সন্ত তুকারামের জীবন চরিত্র লিখেছেন। কিন্তু এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত উনি জীবিত ছিলেন না। ওঁর ভাইরা এই পুস্তকটি **১৯২৮** সালে প্রকাশ করেন। পুস্তকটির ভূমিকায় বালারামের জীবন-বৃত্তান্তে ওঁর শিরডী-যাত্রার এই কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

১) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।। গীতা **৩/২৭**

২) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।। গীতা **৩/১৯**

অধ্যায় - ৫১

উপসংহার, সদ্‌গুরু শ্রীসাইয়ের মহানতা, ফলশ্রুতি ও প্রসাদ যাচনা।

অধ্যায় **৫১** শেষ হয়ে গেছে এবং এবার অন্তিম অধ্যায় (মূল গ্রন্থের **৫২** অধ্যায়) লেখা হচ্ছে। এখানে হেমাডপন্ত যবনিকা টেনেছেন এবং ঐ রকম সূচী লেখার কথা দিয়েছেন, যে রকম অন্যান্য মারাঠী ধার্মিক কাব্যগ্রন্থে বিষয়-সূচী হিসেবে শেষে লেখা হয়। দূভার্গ্যক্রমে হেমাডপন্তের সমস্ত কাগজপত্র খোঁজাখুঁজি করার পরও, সেই সূচী পাওয়া যায়নি। তখন বাবার এক পরম ভক্ত, ঠানের অবসরপ্রাপ্ত মাম্‌লৎদার শ্রী বি. ভি. দেব সেটা রচনা করেন। পুস্তকের শুরুতেই বিষয় সূচী দেওয়ার ও প্রত্যেক অধ্যায়ে বিষয়ের সংকেত শীর্ষক রূপে লেখার আধুনিক প্রথা। তাই উল্লেখিত সূচীপত্র এখানে দেওয়া হচ্ছে না। অতএব এই অধ্যায়টিকে উপসংহার মনে করাটাই ঠিক হবে। দুর্ভাগ্য এই যে, হেমাডপন্ত নিজের লেখা এই অধ্যায়টির সংশোধন করে উঠতে পারেননি।

সদগুরু শ্রী সাইয়ের মহানতা ঃ-

"হে সাই, আমি আপনার চরণ বন্দনা করে, আপনার কাছে 'শরণ' ভিক্ষে চাইছি। আপনিই এই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র আধার।" এই রূপ দৃঢ় ধারণা নিয়ে আমরা তাঁর ভজন-পূজন করলে আমাদের সমস্ত ইচ্ছে শীঘ্র পূরণ হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের পরম লক্ষ্য লাভ করতে পারব। আজ মায়ামোহর ঝঞ্ঝায়, ধৈর্য্যরূপী বৃক্ষ পড়ে গেছে। অহংকার রূপী হাওয়ার জোরে হৃদয়রূপী সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। ক্রোধ

ও ঘৃণার রূপ ধরে, কুমীরেরা সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করছে। অহংভাব ও সন্দেহের ঘূর্ণিতে নিন্দে, ঘৃণা, ও ঈর্ষারূপী মাছ কিলবিল করে খেলে বেড়াচ্ছে। যদিও এই সমুদ্র এত ভয়ানক, তবুও আমাদের সদ্‌গুরু মহারাজ তার মধ্যে অগস্ত্য মুনিস্বরূপ। তাই ভক্তদের কিঞ্চিৎমাত্র ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আমাদের সদ্‌গুরুই জাহাজ এবং তিনিই আমাদের নিরাপদে ভবসাগর পার করিয়ে দেবেন।

প্রার্থনা ঃ-

শ্রী সচ্চিদানন্দ সাই মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, তাঁর চরণ ধরে আমরা সব ভক্তদের কল্যাণ হেতু তাঁর কাছে প্রার্থনা করি- "হে সাই! আমাদের মনের চঞ্চলতা ও বাসনাগুলি দূর করে দাও। হে প্রভু! তোমার দুটি শ্রীচরণ ছাড়া আমাদের মনে অন্য কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি যেন না থাকে। তোমার এই 'সৎচরিত্র' ঘরে-ঘরে পৌঁছক এবং এর যেন নিত্য পাঠ হয় । যে ভক্তরা প্রেমপূর্বক এর পাঠ করে, তাঁদের সমস্ত বিপদ তুমি দূর কোর।"

ফলশ্রুতি (অধ্যয়নের পুরস্কার) ঃ-

এবার এই গ্রন্থটি পাঠ করলে তার কি ফল প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে কয়েকটি কথা লিখছি। **এই গ্রন্থটি পাঠ করলে মনোবাঞ্ছিত ফলের প্রাপ্তি হবে।** পবিত্র গোদাবরী নদীতে স্নান করে শিরডীর সমাধি মন্দিরে শ্রী সাইবাবার সমাধির দর্শন করার পর, এই গ্রন্থটি পাঠ বা শ্রবণ শুরু করলে, তোমার ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) বিপত্তি দূর হয়ে যাবে। সময়-সময় শ্রী সাইবাবার বিষয়ে কথা-বার্তা বলতে থাকলে তোমার আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি অভিরুচি জাগবে এবং যদি তুমি এই ভাবে নিয়মিত ও প্রেমপূর্বক অভ্যাস করতে থাকো, তাহলে তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। **যদি তুমি সত্যি-সত্যি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেতে চাও, তাহলে**

তোমার সাইলীলাগুলি নিত্য পাঠ ও স্মরণ করা উচিত। তাঁর চরণে প্রগাঢ় প্রীতি থাকা উচিত।[১] সাই লীলারূপী সমুদ্র মন্থন করে, তার থেকে প্রাপ্ত রত্নগুলি অন্যদেরও বিতরণ করো। এর দ্বারা তুমি নিত্য নতুন আনন্দ অনুভব করবে এবং শ্রোতা অধঃপতন থেকে বেঁচে যাবে। যদি ভক্তরা অনন্য ভাবে তাঁর শরণে যায়, তাহলে ওদের মমত্ব নষ্ট হয়ে, বাবার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে যাবে- যেমন নদীর সঙ্গে সাগরের। **যদি তুমি তিনটি অবস্থার (অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও নিদ্রা) মধ্যে কোন একটাতেও সাই চিন্তনে লীন থাকো, তাহলে তুমি সাংসারিক চক্র থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। স্নানের পর প্রেম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যে এই গ্রন্থটি এক সপ্তাহে শেষ করতে পারে তার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।[২] যারা এর নিত্য পঠন বা শ্রবণ করবে তারা সব ভয় হতে তক্ষুনি মুক্তি পাবে।** এর পাঠের ফলে প্রত্যেকে নিজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনুসারে ফল পাবে। কিন্তু এই দুটির অভাবে কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। যদি তুমি এইটি শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করো, তাহলে শ্রীসাই প্রসন্ন হয়ে তোমায় অজ্ঞানতা ও দারিদ্রতার পাশ থেকে মুক্ত করে, জ্ঞান, ধন ও সমৃদ্ধি প্রদান করবেন। মন একাগ্র করে, নিত্য একটা অধ্যায়ও যদি পড়ো, তাহলেও অপরিমিত সুখ প্রাপ্ত হবে। এই গ্রন্থটি নিজের বাড়ীতে গুরু পূর্ণিমা, গোকুল অষ্টমী, রাম নবমী, বিজয়া দশমী ও দীপাবলীর দিন অবশ্যই পড়া উচিত। মন দিয়ে যদি তুমি শুধু এই গ্রন্থটিই পাঠ করতে থাকো, তাহলে সুখ ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত করবে ও সততই শ্রী সাই চরণে আসক্ত থাকবে। এই ভাবে সহজেই তুমি ভবসাগর পার হয়ে যাবে। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে রোগীরা স্বাস্থ্য, ধনহীনরা ধন, দুঃখী ও পীড়িতজন শান্তি পাবে

এবং মনের সমস্ত বিকার দূর হয়ে মানসিক স্থিরতা লাভ হবে।

আমার প্রিয় ভক্ত ও শ্রোতাগণ! আপনাদের প্রণাম করে আমার আপনাদের কাছে একটাই বিশেষ নিবেদন যে, যাঁর কথা আপনারা এত দিন ও মাস ধরে শুনলেন, তাঁর পাপহরণকারী ও মনোহর চরণ কখনো বিস্মৃত হতে দেবেন না। যেরূপ উৎসাহী হয়ে, শ্রদ্ধাপূর্বক ও একাগ্রচিত্তে আপনারা এই কথাগুলি পঠন বা শ্রবণ করবেন, শ্রী সাইবাবা সেই রূপই সেবা করার বুদ্ধি আপনাদের প্রদান করবেন। লেখক ও পাঠক এই কাজে পরস্পরের সহযোগীতায় সুখী হয়ে উঠুন।

প্রসাদ যাচনা ঃ-

শেষে আমারা এই গ্রন্থটি সমাপ্ত করার সময় সর্বশক্তিমান পরমাত্মাকে নিম্নলিখিত কৃপা বা প্রসাদ যাচনা করছি -

"হে ঈশ্বর! পাঠক ও ভক্তদের শ্রীসাই চরণে পূর্ণ ও অনন্য ভক্তি দিন। শ্রীসাইয়ের মনোহর স্বরূপই যেন ওঁদের চোখে সর্বদা বাস করে এবং সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে দেবাদিদেব শ্রীসাই ভগবানকে দর্শন করেন।"

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ সমাপ্ত

১) মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।। গীতা ৯/১৩

২) সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।। গীতা ৯/১৪

ওঁ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডনায়ক রাজধীরাজ যোগীরাজ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ সমর্থ সদ্‌গুরু শ্রী সাইনাথ মহারাজ কী জয়।

আরতি

আরতী সাই বাবা। সৌখ্যদাতার জীবা। চরণরজতলী দ্যাবা দাসা বিসাবা, ভক্তাং বিসাবা। আরতী ০।। জাঠুনিয়া অনংগ। স্বস্বরুপীং রাহে দংগ মুমুক্ষু জনা দাবী। জিন ডোঠা শ্রীরংগ। আরতী১। জয়া মনীং জৈসা ভাব। তয়া তৈসা অনুভব। দাবিসী দয়াঘনা ঐসী তুঝী হী মাব। আরতী ।।২।। তুমচে নাম ধ্যাতাং। হরে সংস তি ব্যথা। অগাধ তব করণী। মার্গ দাবিসী অনাথা, দাবিসী অনাথ। আরতী ।।৩।। কলিযুগীং অবতার। সগুণ ব্রহ্ম সাচার। অবতীর্ণ ঝালাসী। স্বামী দত্ত দিগংবর। দত্ত দিগংবর। আরতী ।। ৪।। আঠা দিবসাং গুরুবারীং। ভক্ত করীতি বারী। প্রভুপদ পহাবয়া। ভব ভয় নিবারী। ভয় নিবারী। আরতী ।। ৫।। মাঝা নিজ দ্রব্য ঠেবা। তব চরণরজ সেবা। ভাগণেং হেচি আতাং। তুম্হা দেবাধিদেবা, দেবাধিদেবা। আরতী ।। ৬।। ইচ্ছিত দীন চাতক। নির্মল তোয নিজসুখ। পাজাবেং মাধবা যা। সাংভাঠ আপুলী ভাক। আরতী সাইবাবা। সৌখ্যদাতার জীবা ।। ৭।।

ভাবার্থ

সব প্রাণীদের যিনি সুখ দেন হে শ্রী সাইবাবা, আমরা আপনার আরতি করি। নিজের দাস ও ভক্তদের নিজের চরণের শীতল ছায়ায় স্থান দিন। প্রদীপ্তভাবে আপনি সদা আত্মলীন হয়ে থাকেন এবং মুমুক্ষুজনদের ঈশ্বর প্রাপ্তি করিয়ে দেন। যার যেরকম ভাব হয় আপনি তাকে সেরকমই অনুভূতি দেন। হে দয়ালু! আপনার এমনই বৈশিষ্ট্য। আপনার শ্রীচরণের শুধুমাত্র ধ্যান করেই ভক্তরা এই সংসারের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আপনি সর্বদা দীন ও অনাথদের রক্ষা করেন। আপনার কার্য্যশৈলী অদ্বিতীয় ও অপূর্ব। হে দত্ত! এই কলিযুগে আপনি সগুণ ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই যে ভক্তরা নিত্য বৃহস্পতিবারে আপনার কাছে আসে তাদের সাংসারিক ভয় থেকে মুক্ত করে ভগবদ-দর্শনের যোগ্য করে তোলেন। হে দেবাদিদেব। আপনার চরণকমলই আমার সম্পত্তি। যেভাবে মেঘ স্বাতি নক্ষত্রের জলবিন্দু দিয়ে চাতক পাখীর তৃষ্ণা মেটায়, সেইভাবেই মাধবেরও (এইখানে নিজের নাম উচ্চারণ করুন) তৃষ্ণা মিটিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করুন।

।। ॐ শ্রী সাই যশঃ কায শিরডীবাসিনে নমঃ ।।
ॐ শংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ

মানুষ ভজ রে গুরু চরণম্, দুস্তর ভব সাগের তরণম্।
গুরু মহারাজ জয় জয়, শ্রী সাঁই মহারাজ জয় জয়।।

শ্রী সাইবাবার এগারোটি প্রতিশ্রুতি

শিরডীর ভূমিতে যে দেয় পা
বিপদ-দুঃখ অনায়াসেই দূর হয় তার। (১)

সমাধির সিঁড়ি চড়ে সে
দুঃখের পিড়ী পায়ের তলায় ঠেলে। (২)

দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেও
আসব ছুটে ভক্তের ডাক শুনে। (৩)

মনে ধারণ করো এই দৃঢ় বিশ্বাস
সমাধি পূরণ করে সব অভিলাষ। (৪)

সর্বদা আমায় জীবিতই জেনো
অনুভব করো, সত্যকে চেনো। (৫)

আমার শরণে এসে খালি হাতে ফিরে গেছে
এমন যদি কেউ থাকে জানাও আমাকে। (৬)

যেমন ভাব হয় যে জনের
তেমনি রূপ হয় আমার মনের। (৭)

ভার তোমার দিয়ে দাও আমার উপর
মিথ্যা হবে না কখনো বচন মোর। (৮)

এসে সাহায্য নাও ভরপুর
ইচ্ছা পূরণ নয় বেশী দূর। (৯)

কায়মনোবাক্যে যে শুধু আমার
হয়ে থাকি আমি চিরঋণী তার। (১০)

ধন্য ধন্য সেই ভক্ত অনন্য
আমি ছাড়া নেই যার কেউ অন্য। (১১)

গুরু স্থান

নন্দা দ্বীপ

চাওড়ী

দ্বারকামাঈ

সমাধি-মন্দির

শ্রী সাইবাবার 'সাট্‌কা' (হাতের লাঠি)
ও
পাদুকা - (শ্রী সাইবাবা সংস্থান শিরডী)